প্রীতির-স্মৃতি !

শ্রীযুক্তবাবু নরেন্দ্রকুমার বসু ।

নরেণদা !—

আজ আমার বড় সাধের "রঙ্গ-বারিধি" মায়ের আশীষ মণ্ডিত হইয়া মায়ের অঞ্চলতলে তাহার সল্পায়তন স্থানের প্রয়াসী হইয়া আত্ম প্রকাশ করিতে চলিল। বিপদে বন্ধুরূপে তোমার করুণা দেখিয়াছি ;—দোষে ভ্রাতৃরূপে তোমার তিরস্কার খাইয়াছি ;—আবার আনন্দে ইয়ার-রূপে তোমার রঙ্গ শুনিয়াছি ;—এ বিশ্বে তোমার ভাল-বাসার তুলনা নাই ;—উপমা নাই। তাই এ "বারিধি" তোমার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলাম। কাল মৃত্যু রূপে তোমায় আমায় দূরে—বহুদূরে লইয়া যাইবে ;—কিন্তু যতদিন "রঙ্গ-বারিধি" এ বিশ্বে এক জনকেও রঙ্গ দিতে সক্ষম হইবে, তত দিন তোমার ভালবাসার স্মৃতি,—বাতাসে হেলিয়া ঢুলিয়া গৃহে গৃহে ধ্বনিত করিবে।

২৪শে আগষ্ট
১৯১৫

যতীন—পাল

রঙ্গ-বারিধি।

প্রথম ভাগ

শেষ রক্ষা।

(১)

বহু তর্ক বিতর্কের পর রজনীকান্ত তাহার বন্ধু প্রফুল্লনাথকে সম্মত করাইলেন। প্রফুল্লনাথ দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুল-রক্ষার্থ আত্ম-বলিদানে স্বীকৃত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এ জীবনে বিবাহ না করিয়া একাকী চির কৌতুকে মহা শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু ভগবান বিরূপ। একদিকে বন্ধুর অনুরোধ, অন্যদিকে দরিদ্র ব্রাহ্মণের জাতিপাত,—কাজেই প্রফুল্ল-নাথকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইতে হইল। রজনীকান্ত বলিলেন, "তাহা হইলে অদ্য রাত্রির গাড়ীতেই চল, ললিতের বাড়ী যাওয়া যাক, সে লিখিয়াছে তাহাদের বাড়ী যাইলেই সে মেয়েটিকে তোমায় দেখাইয়া দিবে।"

প্রফুল্লনাথ শীশে ইমনকল্যাণ আলাপ করিয়া বলিলেন, "কাজেই,—শুভস্য শীঘ্রং।"

প্রফুল্লনাথ জমিদারের ছেলে জমিদার,—বহু সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী। ললিতের মত অত বড়লোক না হইলেও দরিদ্র বা গৃহস্থ নহেন, সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য। সংসারে তাঁহার থাকিবার মধ্যে আছেন একমাত্র ৺পিতৃদেবের অশীতি বর্ষীয়া পূজনীয়া জননী ;—সুতরাং তিনি তাঁহার সম্পত্তি বা নিজের সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রফুল্লনাথ একটু খাম-খেয়ালী হইলেও সুচতুর, একটু কৌতুকপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান। তাঁহার মন উদার, সর্ব্বদা পরোপকারে ব্যস্ত।

কথামত উভয়ে যথা সময়ে বাটী হইতে বাহির হইয়া রাত্রির গাড়ী ধরিলেন। পল্লীগ্রামের ষ্টেসন, অর্দ্ধদেহ লৌহযান গহ্বরে প্রবেশ করাইবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িয়া দেয়। রজনীকান্তকে ঠেলিয়া ভিতরে দিয়া প্রফুল্লনাথ তাঁহাদের ট্রাঙ্কদ্বয় রজনীকান্তের ভৃত্যের নিকট হইতে সবলে আকষণ করিয়া ভিতরে লইলেন। অমনি একব্যক্তি "উঁ হুঁ" শব্দে ব্যাকুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দেখতে পাওনা বাপু!"

প্রফুল্লনাথ বিনীতভাবে বলিলেন, "কিছু মনে কর্‌বেন না, মশায়।"

ভদ্রলোক জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "আর মনে করবো আমার মাথা। পা খানা একেবারে চেপ্‌টে গেছে, ফেলে দাও তোমার ঐ—"

"এই সরিয়ে নিচ্ছি মশায়," বলিয়া প্রফুল্লনাথ সবলে বাক্সে টান মারিলেন, বেঞ্চের নিচে ট্রাঙ্ক কিসে আঘাত পাইল, সঙ্গে সঙ্গে একব্যক্তি লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন "গুড়ের কলসীটা ভেঙ্গে ফেল্লে? তুমিতো ভারি ব্যস্তবাগিস লোক হে।"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন, "কিছু মনে—"

সে ব্যক্তি ক্রোধে কাঁপিতে ছিলেন, প্রফুল্লনাথকে আর কথা কহিতে দিলেন না, বলিলেন, "রেখে দাও তোমার কিছু মনে করোনা, বেয়াকুব লোক। মনে করোনা আমার মাথা আর মুণ্ডু। দেখছ না উজ্‌বুক্‌, পয়রাগুড়ের কলসীটা ভেঙ্গে ফেলেছ। কতদূর থেকে কত কষ্ট করে আনছি—আহাম্মক।"

গাড়ীর ভিতর একটা মহা হুলস্থূল পড়িল। তরল

গুড় গাড়ী প্রায় প্লাবিত করিয়া চারিদিকে ছুটিল, প্যাসেঞ্জারগণ যে যাহার জুতা, ব্যাগ, পোঁটলা, কাপড় সরাইয়া লইতে হুড়াহুড়ি আরম্ভ করিল ;—অনেকে চটচটে গুড়ে চর্চ্চিত হইয়া গেল। সকলেই রোষকষাইত লোচনে প্রফুল্লনাথকে ভস্মীভূত করিবার জন্য তাহার দিকে চাহিতেছিল। গাড়ীর ভিতর একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিত—দুই একজন 'মারো শালাকে' বলিতেও ত্রুটি করে নাই। প্রফুল্লনাথ যুদ্ধ সমাগত দেখিয়া একখানা বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"দেখ বাবুরা, এতক্ষণ কোন কথা কহি নাই, আর একটা কথা ঠোঁট দিয়ে বার করিয়াছ কি এক একটার মুণ্ডু ধরিয়া এই গুড়ে জুবড়াইয়া দিব।"

প্রফুল্লনাথের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া সকলে নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল। মনে মনে তাহার কিরূপ আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে লাগিল, তাহা অকথ্য।

যথা সময়ে গাড়ী ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে তাহার গন্তব্যস্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সহযাত্রীদের উপর প্রফুল্লনাথের আর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না, তিনি

রজনীকান্তকে ঠেলিয়া প্লাটফরমে নিক্ষেপ করিলেন ও নিজে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন ! ট্রাঙ্কদ্বয় সবলে টানিয়া প্লাটফরমে ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা গুড় মিশ্রিত জুতা 'আসকে পিঠের' মত ধপ করিয়া নিচে পড়িল প্যাসেঞ্জারগণ আর একবার প্রফুল্লনাথের দিকে ভ্রূকুটী কুটিল দৃষ্টি পাত করিলেন, অনেকেই বিড় বিড় করিয়া তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রফুল্ল-নাথের তাহাতে দৃকপাত নাই। ইত্যবসরে গার্ড 'হুইসিল' দিল, গাড়ী প্লাটফরম ছাড়িয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। এতক্ষণ রজনীকান্ত নীরব ছিলেন, এবার হাসিয়া উঠি-লেন। প্রফুল্লনাথ বলিলেন, "এতক্ষণ হাসি কোথায় ছিল বাপু ?"

রজনীকান্ত বলিলেন, "গাড়ীতে হাসিলে মার খাইতে হইত। একটা হাঙ্গামা করেছিলে আর কি, একটা হাঙ্গামা না নিয়ে থাকতে পার না।"

প্রফুল্লনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে কেবল প্রফুল্লনাথের দুরাদৃষ্ট !"

রজনীকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "ওটা তোমার স্বভাব !

দেখ যেন আবার ললিতদের বাড়ী গিয়ে একটা হাঙ্গামা বাদিও না।”

মস্তকে চাদর বাঁধিয়া প্রফুল্লনাথ ও রজনীকান্ত বাঁধা রাস্তা ধরিয়া ললিতের বাড়ীর দিকে চলিলেন। পশ্চাতে মুটের মস্তকে তাঁহাদের ট্রাঙ্কদ্বয় চলিল। পূর্ব্বে সংবাদ দিলে নিশ্চয়ই ললিতের পিতা রামধন চৌধুরীর বৃহৎ ফিটন ও জুড়ী তাঁহাদের প্রতীক্ষায় ষ্টেসনদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত।

(২)

অর্দ্ধপথে এক বৃহৎ সুদীর্ঘ দিঘির পাড়ে আসিয়া সহসা প্রফুল্লনাথ জমি লইলেন। রজনীকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “আর দূর নাই, ওই বাড়ী দেখা যাচ্ছে।”

প্রফুল্ল নাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “অবগত আছি।”

“তবে চল, আর দেরী করে ফল কি?”

“উঁহু, আমাদের সমাদর কিরূপ হ’বে অবগত না হয়ে প্রফুল্লনাথ এখান থেকে এক পাও অগ্রসর হচ্ছেন না। তুমি অগ্রসর হও, আমি ঐ ‘লম্বা টিকির’ মৎস্য শীকার একটু পর্য্যবেক্ষণ করি।”

শেষ রক্ষা

বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন ;—চারিদিকে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এ সময় প্রফুল্লনাথের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া কোনই ফল নাই ;—ললিতকে ডাকিয়া আনিলেই গোল মিটিয়া যাইবে ; এই ভাবিয়া রজনীকান্ত বলিলেন, "আমি ললিতকে ডাকিয়া আনিতেছি, তুমি তাহা হইলে এইখানেই অপেক্ষা কর।"

প্রফুল্লনাথকে ত্যাগ করিয়া যাইতে রজনীকান্তের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিরুপায়, তিনি মুটে সহ দীর্ঘ পদে বন্ধু সম্ভাষণে চলিলেন।

রামধন বাবুর বৃহৎ অট্টালিকা, একটি গ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্মুখস্থ কাছারি বাড়ীর গদীতে একটী নাদুশনুদুশ ভদ্রলোক নানাবিধ রং বেরংএর লোক পরিবেষ্টিত হইয়া বার দিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকেই একটা গোলমাল, চারিদিকেই বহু লোকজন, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত, এরূপ বৃহৎ ব্যাপার রজনীকান্ত পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। তিনি মুটে সহ সেই বৃহৎ প্রাঙ্গনে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, কি করিবেন, কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই সময়

এক ব্যক্তি দাওয়ান মহাশয়ের কাণে কাণে কি বলিল, দাওয়ান মহাশয় অমনি প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বল কি," তৎপরে অতি সম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রণাম হই, প্রণাম হই, বসতে আজ্ঞা হোক, এখনি কর্ত্তাকে সংবাদ দিতেছি।"

রজনীকান্ত ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলেন না, তিনি স্পন্দিত হৃদয়ে বলিলেন, "অনুগ্রহ করে একবার ললিত বাবুকে খবর দিন। আমার সঙ্গে একটি ভদ্রলোক আছেন।"

দাওয়ান মহাশয় অতি ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন,— "পোড়ো একজন সঙ্গে থাকিবারই কথা। এখনই পাইক পাঠাইয়া ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই বৃহৎ দেহের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কোন গুরুতর গোলযোগ ঘটিয়াছে ভাবিয়া রজনীকান্ত বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয় আমার সঙ্গে একটী বন্ধু আছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ললিত বাবুকে সংবাদ দিন।"

দাওয়ান মহাশয় আকর্ণ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আজ কাল আপনারাও সুসভ্য হইয়া পড়িয়াছেন।

ললিতবাবু আপনার সমবয়সী হইলেও আপনি কর্ত্তার ঠাকুর মহাশয়, তাঁহাকে এখনিই সংবাদ দিতেছি।"

রজনীকান্ত অতি বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনি কি ক্ষেপিয়াছেন। আমি কায়স্থ ; আপনি আমাকে গুরু ঠাকুর বলিতেছেন কোন সাহসে !"

এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "রজনী তুমি ! একি !"

রজনীকান্ত চমকিত হইয়া ফিরিলেন, দেখিলেন সম্মুখে তাঁহার বন্ধু ললিত। বন্ধুর দরশনে একটু আশ্বস্ত হইয়া রজনীকান্ত বলিলেন, "ভাই তোমাদের এ লোকটা কি পাগল, ইনি আমায় প্রণাম করিতেছেন, কি বলিতেছেন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ললিত বিস্মিত ভাবে দাওয়ান মহাশয়ের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "ইনি আমার বিশেষ বন্ধু—রজনীবাবু, আপনি ইহাকে কি স্থির করিয়াছেন ?"

যে ব্যক্তি প্রথম দাওয়ান মহাশয়ের কাণে কাণে কি বলিয়াছিল, দাওয়ান মহাশয় তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই নচ্ছার আমার এই ভুল জন্মাইয়া দিয়াছে, এই কুষাণ্ড বলিল যে ঠাকুর মহাশয়ের আসিবার কথা আছে, ইনিই ঠাকুর মহাশয়।"

ললিত হাসিয়া বলিলেন, "রজনী কিছু মনে করিও না, দাওয়ান মহাশয় তোমাকে আমাদের গুরুঠাকুর ভাবিয়াছেন। আমাদের গুরুঠাকুর বহুকাল আমাদের বাড়ী আসেন নাই, তিনি এক ছেলে রাখিয়া মারা গিয়াছেন, কাল হঠাৎ আমাদের এই নূতন গুরুঠাকুর মহাশয় এক আরজেণ্ট টেলিগ্রাম করেছেন যে, এখানে আজ আসবেন। যাক্ কিছু মনে কর না—এস।"

এস্থলে আর থাকা কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া ললিত হাসিতে হাসিতে রজনীকান্তের হাত ধরিয়া নিজের বৈঠকখানার দিকে চলিলেন। রজনীকান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার কথামত আমার বন্ধু প্রফুল্লনাথকে সঙ্গে আনিয়াছি।"

ললিত অতি ব্যগ্র ভাবে বলিলেন ; "কোথায় তিনি ?"

রজনীকান্ত বলিলেন, "তোমরা ভাই বড়লোক, কিরূপ আদর অভ্যর্থনা হবে তিনি জানেন না, তাই পুকুর পাড়ে বসে আছেন।"

"সেকি এখনিই চল, কোথায় তিনি ?" এই বলিয়া ললিত ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে চলিলেন। ললিত ও রজনী-কান্ত পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া দেখিলেন কেহ কোথায়ও নাই। রৌদ্রে চারিদিক দগ্ধীভূত হইতেছে।

(৩)

রজনীকান্তের বহু বিলম্বে অসীম ধৈর্য্যশালী প্রফুল্ল নাথেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি সহসা লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নীরবে সেই দীর্ঘ-টিকির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় সহসা এক বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিল। দীর্ঘ-টিকি ভীমবলে হস্তস্থ ছিপ টানিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতস্থ প্রফুল্লনাথের উপর পতিত হইলেন; দুইজনে আঘাতিত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে সেই দীর্ঘিকার কর্দ্দমাক্ত জলে পতিত হইলেন। সেই দীর্ঘ-টিকি কর্দ্দমে আপাদমস্তক আপ্লুত হইয়া উন্মুক্ত বস্ত্রে, কম্পিত দেহে, ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "বেল্লিক!" সত্যযুগ হইলে প্রফুল্লনাথ নিশ্চয়ই এই ব্রহ্ম কোপে ভস্মীভূত হইতেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এ কলিকাল, ভস্মীভূত হইলেন না বটে, কিন্তু পচা

পুকুরের পচা পাঁকে নিমজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বেল্লিক নই—বেয়াকুব বটে।"

ব্রাহ্মণ কর্দ্দমাক্ত উত্তরীয়ে মুখের কর্দ্দম অপসারিত করিতে গিয়া তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিতেছিলেন, ইহাতে তাঁহার রাগ, তাঁহার অন্তস্থল হইতে ধূমগিরির উত্তপ্ত খার-প্রস্রবণের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছিল, তিনি কম্পিত, রুদ্ধ-ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তু—তু—তুমি কেহে বাপু? বেয়াকুব—এমন মাছটা ছুটে গেল, আমি তোকে খড়ম পেটা করবো—বেয়াকুব বেল্লিক।"

প্রফুল্লনাথ চক্ষু কর্ণ ও মুখের কর্দ্দম কথঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া বলিলেন, "মহাশয় কিছু মনে করিবেন না, আমার অবস্থা আপনার অপেক্ষা খারাপ হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "প্রফুল্ল না! তুই—তুই এখানে?"

প্রফুল্লনাথ অতি দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "আমার বুড়ো ঠাকুরমা এক্ষণে আমায় দেখলে চমকে উঠতেন, আপনি চিন্‌লেন কি করে?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুই—তুই তুই এখানে? কখন এলি, কোথায় এসেছিস্?"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয় পুকুরের পচা পাঁকের গন্ধে প্রাণ যায়! আগে দেহটাকে ভাল ক'রে মেজে ঘষে নিই—তারপর কথা হবে।"

৪

বহুকাল পূর্ব্বে এই ব্রাহ্মণ সার্ব্বভৌম উপাধীতে ভূষিত হইয়া কলিকাতার এক ক্ষুদ্র বাঙ্গালা স্কুলে লাস্ট ক্লাসে সাড়ে সাত টাকা মাহিনায় পণ্ডিতি করিতেন। আর ঐ সঙ্গে সাড়ে সাতের সংখ্যা একটু বৃদ্ধি করিবার জন্য সকালে ও সন্ধ্যায় বাহিরেও একটু পণ্ডিতি করিতেন। যখন প্রফুল্লনাথ বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত কলিকাতায় আবাস লইয়া বর্ণপরিচয়ের সহিত প্রথম পরিচয় করিতে ছিলেন, সেই সময় সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। আজ প্রফুল্লনাথ সেই বহুকালের বর্ণপরিচয় পরিত্যাগ করিয়া স্তরে স্তরে নানা স্তর অতিক্রম করিয়া আইন-কাননে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহাকে সেই পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েন

নাই, বার্ষিক আদায়ে এক দিনের জন্যও ত্রুটী হয় নাই। বৎসরের পর বৎসর প্রফুল্লনাথ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকের যথাবিহিত পূজা দিয়া আসিতেছেন।

প্রফুল্লনাথ অবগাহনান্তর তীরে উঠিয়া ইস্ত্রি-বিভ্রষ্ট সার্টে মস্তকাদি যথা সম্ভব বিশুষ্ক করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, চলুন আজ আপনার ওখানেই প্রসাদ পাইব।"

সার্ব্বভৌম মহাশয়, ছাত্রের জন্য একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রফুল্লনাথ বড়লোক, সে তাঁহার কুটীরে আহার করিবে, এতো পরম সৌভাগ্য। তিনি ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "এসো বাবা এসো—এতো আমার ভাগ্য।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় অগ্রসর হইলেন, প্রফুল্লনাথ গুরুর অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর আসিবার পর কে অতি মৃদু মধুর মিষ্ট স্বরে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "দাদা, এ কি মূর্ত্তি?"

প্রফুল্লনাথ সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তিনি বিস্মিত অথচ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, পূর্ব্বে জীবনে তিনি আর এমনটী কখনও দেখেন নাই। সম্মুখে একখানি প্রকৃতই ছবি। কিন্তু বহুক্ষণ বিস্মিত হইয়া

থাকিবার পাত্র প্রফুল্লনাথ নহেন, বিশেষতঃ মধুর খিল খিল অঞ্চলাবৃত হাস্যধ্বনিতে কল্পনার অমর-কানন হইতে তাঁহাকে মর জগতে আনিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন সম্মুখে একটী সুন্দরী বালিকা মুখে অঞ্চল চাপিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। বালিকার বয়স প্রায় চতুর্দ্দশ, নিমেষে যতদূর বুঝিয়া লওয়া সম্ভব, সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রফুল্লনাথ বুঝিলেন, বালিকা সুন্দরী, অবিবাহিতা, কুমারী, ব্রাহ্মণ কন্যা। সার্ব্বভৌম মহাশয় ভৎ'সনার স্বরে বলিলেন, "পাগলী! কোন লোকের হাস্যোদ্দীপক অবস্থা দেখিয়া হাস্য করা কর্ত্তব্য নয়। ইনি আমার ছাত্র প্রফুল্লনাথ, দৈবদুর্ব্বিপাকে জলমগ্ন হইয়াছেন। প্রফুল্ল, সুলেখা আমার দৌহিত্রী।"

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "দাদা ওঁকে, দেখে আমি হাসছি না, তোমার একি মূর্ত্তি হয়েছে?"

বৃদ্ধ "আমার" বলিয়া প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিলেন। একবার প্রফুল্লনাথের দিকে, একবার বালিকার দিকে চাহিলেন, ব্যাপারখানা কি ভাল উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। অপরিচিত লোক দেখিয়া বালিকা সলজ্জভাবে এক

পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "দাদা এত কাদা মাটী কোথায় মাখলে। যাও যাও শীঘ্র স্নান করে ফেল।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় একবার প্রফুল্লনাথের দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "সুলেখা প্রফুল্লকে বস্ত্রাদি দাও, আমি অবগাহন করিয়া আসিতেছি।"

ব্রাহ্মণ সত্বরপদে গৃহের পশ্চাৎ দিকে ধাবমান হইলেন। প্রফুল্লনাথের মস্তক কণ্ডূয়ন অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। পূর্ণ যৌবনা বালিকার সহিত কথোপকথন ব্যাপারে তিনি অভ্যস্থ ছিলেন না। স্ত্রীলোক দেখিলে তিনি আতঙ্কে সে স্থান অচিরে পরিত্যাগ করিতেন। অদ্য সহসা এই পল্লীগ্রামে, আম জাম, কাঁটাল বনের ভিতর এই নারীরূপী পুষ্পের সংঘর্ষে আসিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বালিকাও অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিল। এই অপরিচিত যুবককে তাহাদের এক খানা কাপড় আনিয়া দিবে, না ইহার সহিত নিজের বস্ত্রাদি আছে, বালিকা তাহা স্থির করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে দণ্ডায়মান থাকিবার পর অবশেষে বালিকা অবনত

মস্তকে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার সঙ্গে কাপড় আছে কি ?"

প্রফুল্লনাথ ভীমবলে হৃদয়ে সাহস আনিয়া প্রায় জড়িত স্বরে বলিলেন—"না।"

বালিকা সত্বর পদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল ও নিমেষ মধ্যে তাহার দাদামহাশয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গরদের ধুতি ও উত্তরীয় আনিয়া প্রফুল্লনাথের হস্তে দিয়া, ভিতর হইতে পা ধুইবার জল ও এক জোড়া খড়ম আনিয়া দাওয়ার উপর রাখিল। একখানা গালিচা পাতিয়া দিয়া বলিল, "আপনি এইখানে বসুন, আমি আপনার জল খাবারের বন্দোবস্ত করিতে যাই, দাদা এখনই আসিবেন।"

বালিকা অন্তর্হিতা হইল। প্রফুল্লনাথ আজ প্রথম—অন্ধকার কি—তাহা উপলব্ধি করিলেন, মনে মনে বলিলেন, "যথার্থই সুন্দরী।" তিনি বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া একবার নিজমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, মনে মনে হাসিলেন। দুগ্ধফেননিভ পট্টবস্ত্র পরিধান, পট্ট বস্ত্রের উত্তরীয় স্কন্ধে, পদ যুগল খড়মে সুশোভিত, গলায় পইতাতো আছেই।
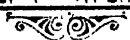
প্রফুল্লনাথ মনে মনে বলিলেন, "কপালে ফোঁটা ও মাথায় একটা লম্বা চৈতন মাত্রের অভাব।"

এই সময় দুই ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদ-নিম্নে পতিত হইল; হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আসুন—পাল্কি এসেছে। ষ্টেসন থেকে ছুটে আসছি। গরীবদের ত্রুটী মাপ করবেন, কর্ত্তা শুনলে আর রক্ষা রাখবেন না।"

(৫)

সুলেখা অতিথির জন্য পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে শ্বেত পাথরের সুন্দর রেকাবীতে নানাবিধ ফল মূল মিষ্টান্ন অতি সুচারুভাবে সাজাইয়া, বামহস্তে রেকাবীখানি ও দক্ষিণ হস্তে গেলাসে সুশীতল পরিষ্কৃত জল লইয়া বাহির বাটীতে আসিল। বাহিরে জনশূন্য, প্রফুল্লনাথ অন্তর্দ্ধান। একটু বিস্মিতভাবে রেকাবী ও জল হস্তে সুলেখা দাঁড়াইয়া চারিদিকে সলজ্জ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু যতদূর দৃষ্টি চলে তাহার মধ্যে কোন স্থানে জনমানবের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। সে খাবার ও জল লইয়া

ফিরিতেছিল, সম্মুখে দেখিল সার্ব্বভৌম মহাশয় সিক্ত বস্ত্রে, গামছা স্কন্ধে নানারূপ শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে অগ্রসর হইতেছেন। সুলেখাকে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, বলিলেন, "তোকে বাবুর বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য পাল্কি আসিয়াছে, এখনই যা। তাঁদের গুরুঠাকুর মহাশয় এসেছেন, খাবার দাবার যোগাড় করে দিতে হবে।"

এতক্ষণে নাতিনীর হস্তস্থিত মিষ্টান্নের প্রতি ব্রাহ্মণের দৃষ্টি পড়িল, তিনি বলিলেন, "মিষ্টান্ন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছ কেন, প্রফুল্ল কোথায় ?"

সুলেখা হাসিয়া বলিল, "দাদা, তুমি বুড়ো হয়েছ, তোমায় যত 'জোচ্চোরে' ঠকায়।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নাতিনীর এই অত্যদ্ভুত কথার ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন "সে কি ?"

সুলেখা তাহার মধুর হাসিতে চারিদিক বিভাসিত করিয়া বলিল, "তুমি যে লোকটাকে সঙ্গে করে এনেছিলে,

আমি তাকে তোমার ভাল গরদের কাপড় চাদর, হাতীর দাঁতের খড়ম পরতে দিয়েছিলেম, সে সব নিয়ে সে লম্বা দিয়েছে।"

এই কথায় ব্রাহ্মণ অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত জিহ্বা দন্তে কাটিয়া চক্ষু আকর্ণ বিস্ফারিত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ও কথা মুখেও আনিও না, প্রফুল্ল বড়লোকের ছেলে, আমার ছাত্র! যা তুই বাবুদের বাড়ী, আমি তাহার অনুসন্ধান লইতেছি।"

"আর মুখে আনিব না, এতক্ষণ দেখগে সে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো," এই বলিয়া সুলেখা হাসিতে হাসিতে তথা হইতে পলাইল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রিয় ছাত্র প্রফুল্লনাথের অনুসন্ধানে বাহিরের দিকে চলিলেন। বাবুর বাড়ীর দাসী ও দ্বারবান পাল্কি লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, সুলেখা পাল্কিতে গিয়া উঠিল, পাল্কি হুঁ হুঁ শব্দে রামধন চৌধুরীর বিস্তৃত অট্টালিকার পশ্চাৎ দিকে ধাবিত হইল।

প্রফুল্লনাথ নাই;—প্রফুল্লনাথ যেন সহসা বাতাসে কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিলেন, "বাঁদর প্রফুল্লটার চরিত্র কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই উচ্ছৃঙ্খল আছে, নিশ্চয়ই একটু কৌতুক করিবার জন্য এইখানেই কোথাও লুকাইয়া আছে।" বৃদ্ধ নিচু হইয়া আম জাম কাঁটালের ঝোপের মধ্যে প্রিয় শিষ্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "পণ্ডিত মহাশয় কি খুঁজিতেছেন, ছাগল নাকি ?"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ফিরিয়া দেখিলেন স্বয়ং জমিদার পুত্র ললিত কুমার তাঁহার দ্বারে উপস্থিত। তাঁহার সঙ্গে একটা সমবয়স্ক যুবক, পশ্চাতে বহু লোকজন। বৃদ্ধ সহাস্য বদনে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন, "চেহারায় নয়,—বুদ্ধিতে বটে।"

ললিত কুমার হাসিয়া বলিলেন, "সে কি রকম ?"

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন, "আমার একটী ছাত্র আজ আমার এখানে আসিয়াছে, বড় লোকের ছেলে, দুষ্টামীতে পরিপক্ক এখনও কিছুমাত্র তাহার চরিত্রের কোরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আমার নাতিনী সুলেখা বলিতেছে সে আমার উৎকৃষ্ট গরদের ধুতি, চাদর ও

হাতীর দাঁতের খড়ম লইয়া লম্বা দিয়াছে ;—না প্রফুল্ল-নাথের এতদূর অধঃপতন হইতে পারে না !"

রজনীকান্ত অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "প্রফুল্ল-নাথ ! সে আপনার ছাত্র ? আপনি তাকে কোথায় পেলেন ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কোথায় পাইলাম ! দীঘির ধারে পাইলাম। আমার আধ-মোনি রোহিতটা গোল করিয়া দিয়াছে। সে পিছনে দাঁড়াইয়াছিল দেখিতে পাই নাই, টান মারিয়া মাছটা বঁড়সিতে গাঁথিলাম, আর বেল্লিকের উপর গিয়া পড়িলাম।"

এই সময় একজন পাইক ছুটিয়া আসিয়া সেলাম দিয়া বলিল, "কৰ্ত্তা তলব দিয়াছেন, গুরু ঠাকুর মহাশয় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।"

এখন কি করা কৰ্ত্তব্য ? ললিত কুমার বন্ধুর দিকে চাহিলেন। রজনীকান্ত বলিলেন, "ভাই তুমি বাড়ী যাও, আমি প্রফুল্লের সন্ধান করিয়া এখনিই ফিরিতেছি।"

এই সময় একজন বৃদ্ধ কৃষক আসিয়া জমিদার পুত্রকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "একজন গোঁসাই ঠাকুর এই-

খানে বেড়াইতেছিলেন, রাজবাড়ীর পাল্কি এসে তাঁকে নিয়ে গেছে।”

সার্ব্বভৌম মহাশয় সবেগে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাঁর কি কাপড় পরা ছিল?”

কৃষক বলিল, “ভাল গরদের কাপড় চাদর, পায়ে খড়ম।”

সার্ব্বভৌম মহাশয় বিস্ময়ে ভয়াবহ ভাবে চক্ষু বিস্ফারিত কবিয়া বলিলেন, “সেই বটে! রাজবাটীর পাল্কিতে গেছে, সে কি? কি একটা বিপদ না জানি ঘটাইল।”

ললিত কুমার আবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন “পণ্ডিত মহাশয় আজ এদেশে বড়ই ভুলচুকের প্রকোপ পড়িয়াছে। আমাদের গুরু ঠাকুর মহাশয়ের আজ আসিবার কথা ছিল, তাঁহাকে আনিবার জন্য পাল্কি ষ্টেসনে গিয়াছিল। বোধ হয় বেহারারা ভুলক্রমে প্রফুল্লবাবুকে গুরুঠাকুর ভবিয়া পাল্কিতে লইয়া গিয়াছে।”

সার্ব্বভৌম মহাশয় অতি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, “আর সেই মূর্খটা কোন কথা না বলিয়া পাল্কি চড়িয়া গেল। সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে কৌতুক! কর্ত্তা শুনিলে আর রক্ষা রাখিবেন না।”

কর্ত্তার কথা উত্থিত হওয়ায় ললিতকুমারও একটু চিন্তিত হইলেন। যদি প্রফুল্লনাথ যথার্থই এ কৌতুক করিয়া গুরু সাজিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা বিশেষ বিরক্ত ও রাগত হইবেন! তিনি রজনী-কান্তের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, প্রফুল্ল বাবু কি যথার্থই এ কৌতুক করিবেন?"

রজনীকান্ত জানিতেন প্রফুল্লনাথের কিছুই অসাধ্য নাই। তিনি মনে মনে বুঝিলেন প্রফুল্লনাথ একটা ভয়াবহ বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভাই কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, এখানে আসিয়া সকলি অদ্ভুত দেখিতেছি।"

(৬)

চৌধুরী মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীর সুন্দর উদ্যান মধ্যে একটি সুন্দর অট্টালিকা ছিল। গুরুঠাকুর প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তি আগমন করিলে, তাঁহার এই বাড়ীতেই বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইত, আজ প্রফুল্লনাথ মহা সমারোহে এই অট্টালিকায় নীত হইয়াছেন। সুন্দর গালিচায় তিনি

উপবিষ্ট,—চারিদিকে বহু লোকের সমাগম। জমিদারের গুরুঠাকুর মহাশয় আসিয়াছেন শুনিয়া চৌধুরী মহাশয়ের জ্ঞাতি-কুটুম্ব-ললনাগণ অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া ঠাকুর বাড়ীতে ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়াছে। প্রফুল্লনাথ অবিচলিত, তিনি নীরবে বসিয়া মনে মনে গবেষণা করিতেছেন; "গুরুগিরি কখনও করা হয় নাই, এ ব্যবসায়ের পর্য্যায় সকল আদৌ তাঁহার অভ্যস্ত নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের কল্যাণে বেশভূষা সম্বন্ধে কোন ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে না, তবে বুলি আয়ত্ত নাই;—এ ঘোর সঙ্কটে নীরব বাক্যহীন থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।"

চৌধুরী গৃহিণী লাল বারানসী সাড়ীতে ভূষিতা হইয়া গুরুঠাকুর মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, কন্যাও লাল বহুমূল্যের একখানি বারানসী পরিয়াছেন। ইনিই যে ললিতকুমারের জননী ও ইনিই যে ললিতকুমারের ভগিনী ইহা বুঝিবার বুদ্ধি প্রফুল্লনাথের সুতীক্ষ্ণ মস্তিষ্কে যথেষ্টই ছিল। ইহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ও আবশ্যক তাঁহার আইন প্রপীড়িত মস্তিষ্কে তাহা প্রবেশাধিকার পাইল না। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই-

লেন। চৌধুরী-গৃহিণী গললগ্নীকৃতবাসে গুরুঠাকুর মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, কন্যাও জননীর অনুসরণ করিল। প্রফুল্লনাথ একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "করেন কি—করেন কি!"

চৌধুরী-গৃহিণী অতি বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গুরুঠাকুর মহাশয়ের বিস্ফারিত চক্ষু, প্রসারিত হস্ত, অর্দ্ধ বহিষ্কৃত জিহ্বা দেখিয়া চৌধুরী-কন্যা অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিল। এই সময় সুলেখা তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। সে গুরুঠাকুরকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বিস্ময়পূর্ণ মুখ দেখিয়া চৌধুরী কন্যা বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিল। সুলেখা তাহাকে টানিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া কাণে কাণে বলিল, "জুয়াচোর।"

চৌধুরী কন্যা প্রায় উচ্চৈস্বরে বলিয়া ফেলিয়াছিল, "জুয়াচোর!" কিন্তু সে কষ্টে আত্ম সংযম করিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য সুলেখাকে লইয়া পার্শ্বের গৃহে পলাইল। চৌধুরী-গৃহিণী কন্যা ও সুলেখার দিকে চাহিয়া ভ্রুকুটি করিলেন। প্রফুল্লনাথ নীরব নিস্পন্দ। তাহার ভাব দেখিয়া চৌধুরী-গৃহিণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে

ছিলেন, এই সময় কন্যার আহ্বানে তিনি ধীরে ধীরে পার্শ্বের গৃহে প্রস্থান করিলেন।

প্রফুল্লনাথ একবার নিমেষে চোরের ন্যায় চারিদিকে চাহিলেন। সুলেখা আসিয়া তাহার বৃত্তান্ত চৌধুরী কন্যার নিকট রং চড়াইয়া বর্ণিত করিয়াছে তাহা বুঝিতে তাঁহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। এখনই সেই অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ যে চৌধুরী-গৃহিণীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে, তাহাও উপলব্ধি করিতে তাঁহার অধিক ক্লেশ পাইতে হইল না। গুরুগিরী যে চূড়ান্ত হইয়া শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন। এক্ষণে লম্বা দেওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই;—কিন্তু পট্টবস্ত্রে, খড়ম পায়ে লম্বা দেওয়া কার্য্যে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। বিশেষতঃ শত্রুপুরী, বহু কালো কালো দীর্ঘ লাঠীহস্তে লাঠিয়ালে, পরিপূর্ণ;—সুতরাং নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া স্থির থাকাই যুক্তি। শুনিলেন পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে চৌধুরী-গৃহিণী বলিতেছেন, "পাগল আর কি!"

সুলেখা মৃদু স্বরে বলিতেছে, "দাদার কাপড় এখনও পরে আছে।"

প্রফুল্লনাথ মনে মনে বলিলেন, "এই ছুঁড়ীর গলা টিপিয়া শেষ কি একটা নর হত্যায় লিপ্ত হইতে হইবে ?"

এই সময় ব্যস্তসমস্ত হইয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তৎপশ্চাতে ললিত ও রজনী-কান্ত; তৎপশ্চাতে প্রায় সমস্ত গ্রামবাসী। সকলে প্রফুল্লনাথকে অবিচলিত ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "প্রফুল্লনাথ, বাপু তোমার চরিত্র বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই !"

"প্রফুল্লনাথ বিনীত ভাবে বলিলেন, "কেন পণ্ডিত মহাশয় ?"

রজনীকান্তের মুখ রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছিল। প্রফুল্লনাথ চিরকালই কৌতুকপ্রিয়, কিন্তু অপরিচিত স্থানে এরূপ ভয়াবহ কৌতুক করা কি উচিত ? চৌধুরী মহাশয় কি ভাবিবেন,—ললিত কি মনে করিবে ? রজনীকান্ত প্রকৃতই মরমে মরিয়া গেলেন। প্রফুল্লনাথের "কেন" শুনিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় তপ্ত তৈলে-বার্ত্তাকুবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন, ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতে লাগিল, তিনি

রুদ্ধ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "এই কি কৌতুক করিবার স্থান, কর্ত্তা শুন্‌লে আর রক্ষা রাখবেন না,—উঠে আয় বানর !"

প্রফুল্লনাথ অবিচলিত ভাবে বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয় কৌতুক বুঝিলেন কিসে ?"

এই সময় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার চির পারিষদ বৃদ্ধ জনার্দ্দন শর্ম্মার সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুগৃহে বৃদ্ধ জনার্দ্দন শর্ম্মাই বৎসরে একবার করিয়া গিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়া আসিতেন;—সুতরাং নূতন গুরুকে কেবল জনার্দ্দন শর্ম্মাই চিনিতেন। তিনি প্রফুল্লনাথকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে ভায়া এসেছ। আমরা তো মনে করেছিলেম, তোমার পদধূলি আর এ বাড়ীতে পড়্‌লো না।"

এই কথায় সকলে স্তম্ভিত। চৌধুরী মহাশয় ভক্তিভরে প্রফুল্লনাথকে প্রণাম করিলেন। প্রফুল্লনাথ মৃদু হাস্য করিয়া বঙ্কিম নেত্রে সুলেখার দিকে চাহিলেন, সে দূরে দ্বার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার মুখ লাল হইয়া চারিদিকে এক অপরূপ শোভা বিস্তার করিয়াছে।

প্রফুল্লনাথ কিয়ৎক্ষণ মস্তক কণ্ডূয়নে নিযুক্ত হইয়া হেঁটমুণ্ডে বলিলেন, "আমার বোধ হয় দু এক কথা বলা আবশ্যক। রজনীকান্ত আমার বন্ধু, ললিতকুমার বাবু তাহার বন্ধু, সুতরাং জ্যামিতির হিসাবে আমারও বন্ধু। রজনীকান্ত একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। সে যখন আমাকে কন্যা দেখিবার জন্য ললিত কুমার বাবুর বাটী যাইতে অনুরোধ করে, তখন আমি শিষ্যগৃহে যাইতেছি জানিতাম না, হঠাৎ মনে পড়িল, তাই আপনাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, রজনীকান্তকে কিছুই বলি নাই, তাহাকে একটু আশ্চর্য্যান্বিত করিবার ইচ্ছা ছিল, বোধ হয় এ কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছি!"

জনার্দ্দন শর্ম্মা বলিলেন, "ও সকল আমরা রজনীকান্ত বাবুর আগেই জানিয়াছিলাম। কেবল তুমি যে আমাদের সেই গুরুঠাকুর প্রফুল্লনাথ এইটুকু জানা ছিল না। যাহা হউক ভায়া সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নাতিনী সুলেখা তোমারই উপযুক্ত, আমরা সকলে জোর করিয়া তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব।"

সকলে মিলিয়া তখন প্রফুল্লনাথকে অনুরোধ-বাণ

বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, সকলের অনুরোধে বাধ্য হইয়া প্রফুল্লনাথ সুলেখাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং হেঁটমুণ্ডে অবনত মস্তকে অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, "কাজেই।"

ললিত কুমারের ভগিনী সুলেখার কাণে কাণে বলিল "তোর বর জুয়াচোর"। সুলেখার মুখ লাল হইয়া গেল সে মৃদু হাসিয়া পলায়ন করিল।

রজনীকান্ত আশ্বস্তির একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, বলিলেন, "যাহা হউক তবু শেষ রক্ষা।"

———— ————

রঙ্গুয়ের চিঠি।

(১)

কলিকাতা,

প্রিয় পরেশ ! ১লা শ্রাবণ ১৩২১।

আজ পনের দিন হইল অতি গোপনে আমি বীণাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি। পিতৃমাতৃহীন অনাথিনী বীণার অশ্রুপূর্ণ নয়নের কাতর আশ্রয় ভিক্ষা, নিজে ভিখারী হইয়াও কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। যে দিন মৃত্যুশয্যায় বীণার মাতা বীণাকে আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদিলেন সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম,—তাহাকে বিবাহ ব্যতীত আমার গত্যন্তর নাই। ঈশ্বর প্রেরিত মহার্ঘ দান ভাবিয়া আমি তাহাকে মস্তকে তুলিয়া লইয়াছি।

আমার ঠাকুরদাদা অর্থাৎ পিতার খুল্লতাতের অতুল সম্পত্তির কথা আমার নিকট নিশ্চয়ই তুমি অনেকবার শুনিয়াছ;—তাঁহার নিজের কোন পুত্র কন্যা না থাকায়

তাঁহার সেই সমস্ত সম্পত্তির তাঁহার অবর্ত্তমানে আমাকেই একমাত্র মালিক করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি সাংঘাতিক-রূপে পীড়িত, বয়সও প্রায় আশীর নিকট পৌঁছিয়াছে। এ অবস্থায় এ যাত্রা তাঁহার রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। কাজেই আশা করা যায় শীঘ্রই আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, এবং তখন বীণাকে লইয়া মহা সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব। সেই সুখের দিনের আশায়, সেই সম্পত্তির ভরসায় আমি বীণাকে বিবাহ করিতে সাহসী হইয়াছি।

এরূপ গোপনে বীণাকে বিবাহ করিবার কারণ কি জানিবার জন্য নিশ্চয়ই তুমি লোলুপ হইবে। আমার ঠাকুরদাদা মহাশয় অবিবাহিত, বাল্যকাল হইতেই কেমন তাঁহার স্ত্রীলোকদিগের উপর মর্ম্মান্তিক ঘৃণা। বিবাহই মানুষকে পশুতে পরিণত করে ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা। তাঁহার প্রতি পত্রেই আমি যাহাতে বিবাহ করিয়া এমন দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম বিচ্যুত হইয়া চতুষ্পদ পশুতে পরিণত না হই সে বিষয়ে বার বার নিষেধ করিয়াছেন। এমন কি আমি যদি পশু হই অর্থাৎ আমি যদি বিবাহ করি তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইব সে কথাও

ইঙ্গিত করিতে ছাড়েন নাই। বিবাহের উপর এরূপ ঘৃণা যে, বৃদ্ধ বিবাহিত দেবতাও পূজা করিতে প্রস্তুত নন; সেইজন্য পশ্চিমে তাঁহার বাসার নিকটে এক কার্ত্তিক ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যদি আমি বিবাহ করি তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এই চির-কুমার দেবতা কার্ত্তিককেই দিয়া যাইবেন। বুড়ো তো নিজে বিবাহ করেই নাই, যাহাতে আমিও না বিবাহ করি তাহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। এ অবস্থায় যতদিন পর্য্যন্ত না বৃদ্ধের মৃত্যু হয়, ততদিন এ বিবাহ গোপন রাখাই যুক্তি সঙ্গত। সুখে দুঃখে চলিয়া যাইতেছে এইমাত্র। ইতি :—

তোমার চিরপ্রিয় বন্ধু—গণেশ।

(২)

কলিকাতা,

প্রাণের সই!— ২রা শ্রাবণ ১৩২১।

নানা গোলযোগে তোমার পত্রের উত্তর যথা সময়ে দিতে পারি নাই। এ কয় মাস আমার কি ভাবে কাটিয়াছে তাহা বোধ হয় আর তোমাকে লিখিয়া

জানাইতে হইবে না। সকল দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া যেদিন আমাকে মা চিরদিনের মত ফেলিয়া চলিয়া যান, সে দিনের কথা ভাবিলে আজ পর্য্যন্ত আমার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠে। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় করুণাময়ের করুণায় আজ আমি যেমন সুখী এত সুখী বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ নাই। পূর্ব্ব পত্রে যাঁহার কথা আমি তোমায় লিখিয়াছিলাম, যাঁহার কৃপায় রুগ্ন শয্যায় মায়ের অনাহারে মৃত্যু হয় নাই, তিনি আমার ন্যায় হতভাগিনীকেও দয়া করিয়া পদে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার অগাধ ভালবাসায় এখন আমার ক্ষুদ্র হৃদয় পরিপূর্ণ।

আপাততঃ আমাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় মন্দ। আমার স্বামীর পরিচয় তুমি পূর্ব্বেই পাইয়াছ, তিনি চিত্রকর। তিনি যে সকল চিত্র আঁকেন তাহা আমার চক্ষে অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাহা বাজারে কখন কদাচিৎ এক আধখানি বিক্রয় হয় মাত্র।

আমার স্বামীর পশ্চিমে এক অতিশয় কৃপণ ধনবান ঠাকুরদাদা আছেন। সেই বৃদ্ধ প্রতি মাসে খরচের জন্য যে সামান্য টাকা পাঠান, তাহাতে এযাবৎ তাহারই অতি

কষ্টে চলিতেছিল ; একক্ষণে আমার জন্য তাহাকে প্রত্যহই ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়িতে হইতেছে। যাহা হউক শীঘ্রই আমাদের স্বচ্ছল হইবার সম্ভাবনা। সেই বৃদ্ধ সম্প্রতি মৃত্যুশয্যায় শায়িত প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদের আশা করিতেছি। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার স্বামীই সেই অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। শীঘ্রই যে আমাদের সমস্ত অভাব মিটিবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অন্যান্য খবর মঙ্গল ; আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। পত্রের উত্তর শীঘ্র দিতে ভুলিও না। ইতি—

তোমার সই—বীণাপাণি।

(৩)

কানপুর,

৪ঠা শ্রাবণ ১৩২১।

কল্যাণবরেষু !—

গণেশ,—অতি শীঘ্রই আমি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যাইতেছি। এখানকার স্থানীয় চিকিৎসকগণ

সকলেই একবাক্যে বলেন, স্থান পরিবর্ত্তন ব্যতীত এ রোগ কিছুতেই নিরাময় হইবেনা। অনেক চিন্তার পর তোমার ওখানে কলিকাতায় যাওয়াই স্থির করিয়াছি। এ সময় তোমার নিকটে থাকিলে সর্ব্ব বিষয়েই সুবিধা। আগামী শুক্রবার মেলে আমি এখান হইতে রওনা হইব। আমার থাকিবার জন্য একটী ঘর পরিষ্কার রাখিও। অনর্থক খরচ বাড়াইয়া কোন লোক আর সঙ্গে লইলাম না। তুমি আমার পরিচর্য্যার জন্য একটী লোক ঠিক করিয়া রাখিও; কারণ এ অবস্থায় পরিচর্য্যার জন্য একটী লোক সর্ব্বদাই প্রয়োজন। রোগের জন্য যে সকল আমার খুঁটিনাটী প্রয়োজন হইবে, তাহা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দ্বারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। তুমি একটী ধীর প্রকৃতির বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিও; বেতন যাহাই লাগুক সে জন্য চিন্তা করিও না। স্বাস্থ্য ও শক্তি পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আমি ব্যয় করিতে কাতর নই। আমার শরীরের অবস্থা এখন পর্য্যন্ত অতিশয় দুর্ব্বল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক,—ঠাকুরদাদা।

(৪)

কলিকাতা

প্রিয় পরেশ !— ৫ই শ্রাবণ ১৩২১

আজ ঠাকুরদাদার এক পত্রে আমার সকল আশা ভরসা একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে বসিয়াছে। এ বিপদ হইতে যে কিরূপে উদ্ধার হইব তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে। আগামী শনিবার চিকিৎসার জন্য বৃদ্ধ কলিকাতায় আসিতেছেন, তাঁহার বিশ্বাস তিনি আবার নিরাময় হইয়া পূর্ব্ব শক্তি লাভ করিবেন। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা দেখ কি ভয়ঙ্কর! তাঁহার নিরাময়ের জন্য আমাকেই আবার তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইবে।

গত কয়েক মাস হইতে আমার ছবি একখানিও বিক্রয় হয় নাই, কাজেই বুঝিতে পারিতেছ টাকার আমার কিরূপ প্রয়োজন। এ অবস্থায় কোথায় তাঁহার মৃত্যু সংবাদ আসিবে, না আসিল তাঁহার নিরাময়ের জন্য আগমন সংবাদ। সেজন্যও আমি বিশেষ চিন্তিত হইতাম না, কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তা বীণার জন্য। বুড়া

যদি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে আমার বিবাহ হইয়াছে, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই আমাকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবে। আমাকে চিরদিনের মত সত্য সত্যই পথের ভিখারী হইতে হইবে। আমার এমন কোন বন্ধু বা আত্মীয় নাই যেখানে কিছু দিনের জন্য বীণাকে গোপনে রাখিতে পারি অথবা আমার অবস্থাও এমন সচ্ছল নয় যে, অন্যত্র তাহাকে গোপনে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারি। এই ভয়াবহ বিপদে পড়িয়া আমার মস্তক সম্পূর্ণই বিকৃত হইয়া গিয়াছে;—পত্র পাঠ এখন আমার কি করা সদযুক্তি লিখিয়া জানাইবে। ইতি ঃ—

তোমার চিরপ্রিয় বন্ধু—গণেশ।

(৫)

কলিকাতা,

৬ই শ্রাবণ ১৩২১।

প্রাণের সই !—

আজ আমরা বড় বিপদগ্রস্ত। আমার স্বামীর সেই ঠাকুরদাদা চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন।

তিনি এখানেই থাকিবেন। আমাদের বিবাহের বিষয় তিনি কিছুই জানেন না ; এ বিবাহ তাঁহার নিকট গোপন করা হইয়াছিল। কারণ তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নয় যে, তাঁহার নাতি বিবাহ করে। তাঁহার ধারণা স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ অপেক্ষা বিষধর সর্পের সংস্পর্শও মঙ্গলজনক। তা ছাড়া তিনি যখন শুনিবেন, আমার স্বামী তাঁহার অমতে গোপনে বিবাহ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয় তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবেন ও অবিলম্বে মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন। মাসহারা বন্ধ করিলে যে, আমাদের অনাহারে মরিতে হইবে তাহা সুনিশ্চিত।

কাল প্রায় সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়াও আমরা কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। আমরা ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছিলাম ; শেষ বুড়োর পত্রখানা পড়িতে পড়িতে একটা মতলব মাথায় আসিয়াছে , জানি না তাহা কতদূর সম্ভবপর হইবে। ঠাকুরদাদা মহাশয় তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য একজন বৃদ্ধা দাসী নিযুক্ত করিতে লিখিয়াছেন। আমরা স্থির করিয়াছি, আমার স্বামী আমাকে তাঁহার নিকটে সেই দাসী বলিয়া পরিচিত

করাইবেন। জানি না ভাই ভগবানের মনে কি আছে। ইতি—

তোমার সই—বীণাপাণি।

(৬)

কলিকাতা,

১১ই শ্রাবণ ১৩২১।

প্রাণের সই!

বুড়ো আসিয়া পৌঁছিয়াছে;—এরূপ ভয়ঙ্কর গম্ভীর প্রকৃতির লোক আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই। কিছুতেই তাঁহার সন্তোষ নাই.—দিন রাত কেবল খিট্‌খিট্‌ করিতেছেন। তিনি যে জীবনে কখনও হাসিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলে তাহাতো বোধ হয় না। আসিয়া পর্য্যন্ত যেরূপ খিঁচুনী ও তিরস্কার আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে আমার ভয় হয়, বুঝি বা আমাদের সমস্ত মতলবই পণ্ড হইয়া যায়।

সে দিন প্রত্যুষে যখন আমার স্বামী আমাকে দাসী বলিয়া পরিচিত করাইবার জন্য তাঁহার নিকট লইয়া যান, তখন আমার বুকের ভিতর কি হইতেছিল তাহা কেমন
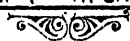
করিয়া তোমায় লিখিয়া জানাইব। যাঁহার জন্য আমি পথের ভিখারিণী হই নাই,—যাঁহার ভালবাসায় আজ আমি এত সুখী, তাঁহার জন্য সামান্য দাসী সাজা কি এতই কঠিন? এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা মুহূর্ত্তে যেন দূর হইল, আমি আমার স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবনত মস্তকে বুড়োর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সত্য কথা বলিতে কি তখনও আমার ভয়ে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল। আমাকে দেখিবামাত্র তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্ত্তাকুবৎ বৃদ্ধ জ্বলিয়া উঠিলেন। আমার স্বামীকে নানারূপ তিরস্কার করিয়া তখনই আমাকে বিদায় করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন, "এরূপ দাসীর পরিচর্য্যা অপেক্ষা অসহায় ভাবে রোগ শয্যায় পড়িয়া থাকা ভাল। দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়।" আমার স্বামী অনেক চেষ্টায়ও বৃদ্ধা দাসী পাওয়া যায় নাই, এবং আমায় দেখিতে যত কম বয়স বলিয়া বোধ হয় তাহাপেক্ষা আমার বয়স অনেক বেশী প্রভৃতি নানারূপ মিথ্যা কথা বলিয়া শেষে বহু কষ্টে তাঁহাকে কতক ঠাণ্ডা করিতে

পারিয়াছেন। এ সত্বেও বুড়ো অবিলম্বে আমার স্বামীকে বৃদ্ধা দাসীর সন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং সাত দিন কেবল আমার কাজ পরীক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহারই মধ্যে দুইবার তিরস্কার হইয়া গিয়াছে। তিনি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এরূপ মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তিরস্কার করেন, যাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব, কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সমস্ত অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া যেমন করিয়া পারি বুড়োকে বশ করিবই করিব। দিন রাত্রি আমার বুক দুর দুর করিতেছে,—সম্মুখে আমার ভীষণ পরীক্ষা। ইতি—

তোমার সই—বীণাপাণি।

(৭)

কলিকাতা,

১৩ই শ্রাবণ ১৩২১!

প্রিয় মথুর!

আমি শনিবার এখানে নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পথের কষ্টে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম; তাছাড়া আমার অবিবেচক নাপিটা আমার স্পষ্ট লেখা

সত্ত্বেও আমার জন্য একটা যুবতী দাসী নিযুক্ত করায়, মেজাজ আমার এরূপ খারাপ করিয়া দিয়াছিল যে, পৌঁছান সংবাদটা পর্য্যন্ত তোমাকে যথা সময়ে লিখিতে পারি নাই। যাহা হউক দাসীটাকে আমি যেরূপ ভাবিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা একটু ভাল বলিয়াই বোধ হয়। যুবতী বটে, কিন্তু কোনরূপ বাচালতা নাই, আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান একেবারে নাই এ কথাও বলিতে পারা যায় না। কাজ কর্ম্মও করিতেছে মন্দ নয়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না স্ত্রীলোকের সাহায্য ব্যতীত নিজের কাজ নিজে সমস্ত করিতে পারিতেছি, ততদিন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নই। এই কালসর্পী দিগের নিকট হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। ইতি—

তোমার বশংবদ

শ্রীদুর্গাদাস বসু।

(৮)

কলিকাতা

১৩ই শ্রাবণ ১৩২১

প্রাণের সই!

তোমার পত্র পাইলাম, অধিক কিছু লিখিবার নাই।

বুড়ো পূর্ব্বের অপেক্ষা একটু ভাল, শারীরিক তো বটেই, ব্যবহারেও কতকটা। খিট্‌খিটি্নী ও তিরস্কারের বিরাম নাই তবে সুরাহার মধ্যে এইটুকু যে, তিনি যে কয়দিন কলিকাতায় থাকিবেন আমাকেই স্থায়ীভাবে দাসী নিযুক্ত করিয়াছেন। চেষ্টার কতক ফল পাইয়া আমি দ্বিগুণ উৎসাহে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। ভগবান যদি সহায় হন, তুমি দেখিও আমি বুড়োকে এরূপ বশ করিব যে, যখন তিনি শুনিবেন তাঁহার নাতির সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে তখন বিন্দুমাত্র রাগ না করিয়া বরং আনন্দিতই হইবেন। ইতি—

তোমার সই বীণাপাণি।

(৯)

কলিকাতা,

১৫ই শ্রাবণ ১৩২১।

প্রিয় মথুর !

পূর্ব্বের অপেক্ষা এখানে আসিয়া আমার শরীর অনেক ভাল। এখানে আমার পরিচর্য্যার জন্য যে দাসীটি

নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহার উপর আমার যে ধারণা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ভুল। স্ত্রীলোক যে এত ভাল হইতে পারে, তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এখন আমি দেখিতেছি এ সংসারে স্ত্রীলোকের ন্যায় নিরীহ জীব আর দুটী নাই। আমার আরাম ও সুখের জন্য তাহার যত্ন ও আগ্রহ দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। তাহার যত্নে ও সেবায় আমি এমনই মুগ্ধ হইয়াছি যে, সর্ব্বদাই মনে হয় যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পশ্চিমে ফিরিব তখন তাহার অভাব আমায় নিশ্চয়ই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে। তাহার সেই সদা হাসিমাখা মুখখানির প্রতি চাহিয়া আমার এক এক বার মনে হয়, যদি তাহাকে আরোও ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেখিতাম তাহা হইলে বোধ হয় আমার জীবনের প্রবাহ অন্যদিকে বহিত। কিন্তু তখনই আবার মনে হয় তাহার বহু পরে এ কেবলমাত্র পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মোটের উপর আমাকে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এত দিন পরে আমি এমন একটী স্ত্রীলোক দেখিলাম, যে আমার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে চিরকালের দৃঢ় ধারণাকে

একবারে সমূলে উল্টাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। সে যে কোন উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা তাহার ভাব ভঙ্গিতে কাহারও বুঝিতে বাকী থাকে না। তথাপি আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি; সে আমাদের স্বজাতি ও অতি মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কেবল অবস্থা বৈগুণ্যে দাসীবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে। ওখানকার সংবাদ সবিস্তারে লিখিবে। ইতি— তোমার বশংবদ

শ্রীদুর্গাদাস বসু।

পুনঃ—যদি কোন বৃদ্ধ তাহাপেক্ষা অনেক অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে কি তাহা অতিশয় হাস্যজনক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়? সত্যই কি সে সমাজের নিকট ঘৃণিত হয়? আমার তো মনে হয় ইহাতে ক্ষতি কি।

(১০)

কলিকাতা,

১৬ই শ্রাবণ।—

প্রাণের সই!

ভাই তুমি নিশ্চয়ই শুনিয়া আনন্দিত হইবে যে,

আমারই সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে। বুড়োর আর সে ভাব একেবারেই নাই, এখন তিনি আবার আমার প্রতি তাঁহার সেই কোটর নিমজ্জিত মিট্‌মিটে নয়ন যুগলের প্রেমপূর্ণ অদ্ভুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—দেখি, আর মনে মনে হেসে মরি! আমার উপর বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, এখন আমাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিবার জন্যই ব্যস্ত। সন্ধ্যার পর প্রত্যহই আমাকে নিকটে বসাইয়া অতি স্নেহে তাঁহার পশ্চিমের কত গল্প শোনান। নাৎ-বৌকে লইয়া ঠাকুরদাদা মহাশয়ের এইরূপ টানা হেঁচ্‌ড়া দেখিয়া আমার স্বামী তো অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, যে সময় বুড়ো আমার সহিত গল্প করে সেই সময় এক দিন তাঁহার নিকট সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে তাহা হইতে নিরস্ত রাখিয়াছি, কারণ এখন পর্য্যন্ত আমি আমার জয় সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হই নাই। ইতি—

তোমার সই—বীণাপাণি।

(১১)

কলিকাতা,

১৮ই শ্রাবণ ১৩২১।

প্রিয় মথুর !

আজ যাহা আমি তোমায় লিখিতেছি, ইতি পূর্ব্বেই বোধ হয় তুমি তাহার কতকটা আভাস পাইয়াছ। আমি আমার এই সর্ব্বগুণসম্পন্না দাসীটিকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছি। আজীবন বিবাহে ভয়ঙ্কর ঘৃণা সত্ত্বেও এক্ষণে বিবাহ করিতে অগ্রসর হওয়ায় তুমি নিশ্চয়ই বিশেষ বিস্মিত হইবে কিন্তু যখন তুমি আমার হৃদয়রাণীকে দেখিবে তখন তোমার আর বিস্ময়ের কোনই কারণ থাকিবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহাকে আমার শূন্য হৃদয়ের অধিশ্বরী করিয়া জীবনের শেষ কয়টা দিন অতি সুখেই কাটাইতে পারিব। যে আমাকে বুঝিয়াছে, এবং আমিও যাহাকে বুঝিয়াছি তাহাকে যদি জীবন-সঙ্গিনী করিতে না পারিলাম তাহা হইলে আর জীবনে সুখ কি? তুচ্ছ ৫০।৬০ বৎসরের তারতম্যের জন্য কখনই জীবনের এত সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে পারা যায় না। হায়! ইহারই মত আরো কত

উচ্চ বংশের ললনা, দারিদ্র্য তাড়নে তাড়িত হইয়া চির জীবনের জন্য চরিত্র কলুষিত করিয়া পাপের অনন্ত স্রোত প্রবাহিত করিতেছে। যদি ইহাদের একটীকেও রক্ষা করিতে পারি,—তাহা হইতে আর কি মহৎ কাজ হইতে পারে? এরূপ মহৎ উদ্দেশ্যে যদি আমার ন্যায় ব্যক্তি আত্মোৎসর্গ না করে, তবে আর কে করিবে? হয় ত শেষ জীবনে আমিই একটা এ সংসারে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া যাইতে পারিব। যাক আমি তোমাকে অনর্থক যুক্তি দেখাইয়া বিরক্ত করিতে চাহি না। তুমি আমার বাল্যবন্ধু তাই এ সঙ্কল্প সর্ব্ব প্রথম তোমাকেই জানইতেছি।

স্ত্রীলোককে চিরকাল তাচ্ছিল্যই করিয়া আসিয়াছি, কাজেই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তুমি অনেক নাটক নভেল পড়িয়াছ, জীবনের প্রায় তৃতীয়াংশকাল স্ত্রীলোকের সহিত কাটাইলে, তুমি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অনেক বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ। কি উপায়ে এবং কি ভাবে এই সঙ্কল্প প্রকাশ করা যায়,—পত্র পাঠ আমায় লিখিয়া জানাইবে। কোন ক্রমে এ কথা একবার তাহাকে

জানাইতে পারিলেই আমি নিশ্চয় জানি, সে আশাতীত আনন্দের সহিত সম্মত হইবে। ইতি—

বশংবদ—শ্রীদুর্গাদাস বসু।

১২

কলিকাতা,

২০ শে শ্রাবণ ১৩২১।

প্রাণের সই!

এখানে ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বুড়োকে বশ করিতে যাইয়া আমি এত অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছি যে, বুড়ো শুধু বশ হয় নাই, আমাকে ভালবাসিয়াও ফেলিয়াছে। লজ্জার কথা আর লিখিব কি, ঠাকুরদাদা মহাশয় আমাকে বিবাহ করিতে চান।

কাল রাত্রে যখন তিনি আমাকে নিকটে বসাইয়া নানাবিধ গল্প করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে আমার সন্দেহ হইয়াছিল। বদ্‌রসিক বুড়োকে ক্রমেই আমার গা ঘেসিয়া বসিতে দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছিল কিন্তু সম্পর্কে ঠাকুরদাদা,—দোষ নাই ভাবিয়া বহু

কষ্টে মনের ভাব মনেই দমন করিতে ছিলাম। কিন্তু আজকে যখন তাঁহার ধন সম্পত্তির কথা তুলিয়া আমাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, তখন সত্যই আমি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলাম। বুড়োর বিনয় ও মিনতিপূর্ণ বাক্যে আমি বহুকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, আপনার আশ্রয়ে থাকা অপেক্ষা আমার আর অধিক কি সৌভাগ্য হইতে পারে,—কিন্তু এরূপ গুরুতর বিষয় চিন্তা করিবার জন্য আমায় কিছু দিন সময় দেওয়া উচিত। বুড়ো আমার কথায় আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমাকে চিন্তা করিবার জন্য সাতদিন সময় দিয়াছেন। কি যে হইবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শীঘ্রই বুড়োকে জবাব দিতে হইবে। বিবাহে অমত করিয়া তাঁহার নিকট আর কিছুতেই দাসীগিরি করা চলিবে না;—তখন নিশ্চয়ই আমাকে এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তাহার পর যখন সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ পাইবে তখন না জানি, কি ভয়ঙ্কর গণ্ডগোলই উপস্থিত হইবে। প্রতারণা করা যে কি ভয়ানক অন্যায় কাজ তাহা এক্ষণে প্রাণেপ্রাণে অনুভব করিতেছি। পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার চারিদিক হইতে

আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। ভাই আমার অবস্থা এখন অতীব শোচনীয়। ইতি—

তোমার সই—বীণাপাণি।

১৩

কানপুর,

২০শে শ্রাবণ ১৩২১।

প্রিয় দুর্গাদাস!

আজ মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমার পত্র দুইখানি পাইলাম। বাড়ী না থাকায় পত্রের উত্তর যথা সময়ে দিতে পারি নাই। কারবারের নানা গোলযোগে আমি এরূপ জড়িভূত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার সময় এখন নাই বলিলেই হয়; তথাপি তোমাকে তোমার পাগলামি হইতে নিরস্ত করিবার জন্য তাড়াতাড়ি এই কয়েক ছত্র লিখিলাম। তুমি লিখিয়াছ, এ বৃদ্ধ বয়সে বিবাহে ক্ষতি কি, আমি বলি ক্ষতি যথেষ্ট।

আমার বিশেষ অনুরোধ বিবাহের মতলব অবিলম্বে পরিত্যাগ কর। বয়স আধিক্যে ও রূপমোহে তোমার বোধ হয় স্মরণ হয় নাই যে, বিবাহের বয়স তোমার নিকট

হইতে প্রায় ৬০ বৎসর পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস রোগে তোমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। উন্মাদ ভিন্ন এ বয়সে বিবাহের মতলব আর কাহারও হইতে পারে না। ইতি—

বশংবদ,

শ্রীমথুরচন্দ্র দাস।

(১৪)

কলিকাতা,

২২শে শ্রাবণ ১৩২১।

প্রিয় মথুর!

আমি তোমার পত্রের ভাব বুঝিতে পারিলাম না। আমার মাথা খারাপ হয় নাই, যদি মাথা কাহার খারাপ হইয়া থাকে তবে সে তোমার। তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই আমি বিবাহের কথা পাড়িয়া ছিলাম, সে আনন্দের সহিত সম্মতি দিয়াছে। তবে প্রস্তাবটা বড় সহসা হওয়ায় সে চিন্তার জন্য কিছু দিনের সময় লইয়াছে মাত্র। তাহার কথার ভাবে আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি যে, এই সময় লওয়টা আর কিছুই নয়, ওটা স্ত্রীলোক মাত্রেরই স্বভাব। তুমিত

জানই তোমাকেই কতবার বলিতে শুনিয়াছি, মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। নিজেদের আত্ম-মর্য্যাদা কেমন করিয়া রাখিতে হয় তা এরা বেশ জানে। বড়ই দুঃখের বিষয় যাহা কাহারও নিকট হাস্যজনক ও অসম্ভব হইল না, তাহাই কেবল তোমার নিকট পাগলামী হইল। আশা করি ফেরত ডাকে এই বিবাহে তোমার আনন্দ-সূচক পত্র পাইব। ইতি—

বশংবদ

শ্রীদুর্গাদাস বসু।

(১৫)

কলিকাতা,

২৪শে শ্রাবণ ১৩২১।

প্রাণের সই !

ক্রমে ব্যাপার আরোও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। বুড়ো নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার খেয়ালে ভাবিয়াছে আমি নাকি বিবাহে সম্মত হইয়াছি। আজ কাল তাহার গৃহে যাইলে তাহার মোরছে-ধরা ভালবাসা ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার

করিয়া নানা প্রকারে আমার সম্মুখে ধরিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করে। আমার স্বামীতো কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। আমা-দের আর কোন বুদ্ধিই যোগাইতেছে না। তুমি যদি এখন এ বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য তোমার বুদ্ধির থলে ইইতে কিছু ধার দিতে পার, তবে বিশেষ উপকার হয়।

তোমার সই—বীণাপাণি।

(১৬)

কানপুর.

২৬শে শ্রাবণ ১৩২১।

প্রিয় দুর্গাদাস!

তুমি একেবারে সম্পূর্ণ পাগল হইয়া গিয়াছ। যে তোমার সন্তানের সন্তান হইবার যোগ্য, তাহাকে তুমি কোন হিসাবে বিবাহ করিতে যাইতেছ? এ কথা লিখিতে তোমার বিন্দুমাত্র লজ্জা হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। তোমার ন্যায় বৃদ্ধ;—যাহার শেষ ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে,—ইহাতেও কি বুঝিতে পারিতেছ না, যে সে বিবাহে সম্মতি দিয়াছে বটে, কিন্তু সে বিবাহ

তোমার সহিত নহে, তোমার সম্পত্তির সহিত। সে তোমাকে চায় না, তোমার টাকা চায়। আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি যে, তোমার বয়সেও লোকে স্ত্রীলোকের ফাঁদে পড়ে। একবারও কি ভবিষ্যৎ ভাবিতেছ না? বৃদ্ধ বয়সে যুবতীকে বিবাহ করিয়া বাকী জীবনটা কিরূপ ভয়াবহ দুঃসহ হইয়া উঠিবে,—নিজের সমস্ত আরামটুকু নষ্ট করিয়া একটা যুবতী রমণীর দ্বারা চালিত হইবে;—তখন তোমার ওই কালমুখ লইয়া কিরূপে বন্ধুবর্গের সম্মুখে বাহির হইবে? সমাজে সমস্ত লোক অঙ্গুলি দিয়া দেখাইবে, এই সেই লোক—যে বৃদ্ধ বয়সে এক খেলওয়াড় রমণীর পাল্লায় পড়িয়া একেবারে উজবুক বনিয়া গিয়াছে। সেটা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? না একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছ, একেবারে নাছোড় বান্দা। আমার বিশেষ অনুরোধ এখনও এই বুড়োর পরামর্শ লইয়া সময় থাকিতে সাবধান হও। ইতি—

বশংবদ

শ্রীমথুরচন্দ্র দাস

(১৭)

কলিকাতা,

২৯শে শ্রাবণ, ১৩২: ।

প্রিয় মথুর !

তোমার শেষ পত্রে আমায় ভাবিত করিয়াছে। আকস্মিক মোহে সত্যই উন্মাদ হইয়া ছিলাম। বালিকার সেবায় ও যত্নে আমি এমনিই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, অনেক বিষয়ই আমি মোটেই লক্ষ করি নাই। বিবাহের কথা পাড়িবার পর হইতেই তাহার ব্যবহারের আকাশ পাতাল তারতম্য দেখিতেছি। এক্ষণে আর সে যত্ন ও সেবা নাই,—প্রতি পদেই অতি সুস্পষ্ট শৈথিল্য প্রকাশ পাইতেছে। আমার নিকট হইতে যাহাতে দূরে দূরে থাকিতে পারে সাধ্যানুযায়ী তাহারি চেষ্টা করে। তাহার এই অবজ্ঞার ভাব দেখিয়া অতি সহজেই অনুমান হয় যে, সে কেবল আমার ন্যায় বৃদ্ধকে অর্থের লোভেই বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু আমার অবস্থা কতকটা সাপের ছুঁচা গিলিবার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, না পারি গিলিতে না পারি উগ্‌রাইতে। বিবাহের অলঙ্কারের জন্য সেক্‌রাকে

৫০০৲ শত টাকা বায়না দিয়াছি, পশ্চিমে প্রায় সমস্ত বন্ধুকেই এ বিবাহে যোগ দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছি; মোটকথা বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়ের মধ্যে একথা জানিতে কাহারও বাকি নাই। এক্ষণে যদি বিবাহ না হয়, তাহা হইলে কেলেঙ্কারীর একশেষ হইবে। তা'ছাড়া এরূপ স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মান মর্য্যাদার ভয় একেবারেই রাখে না। এখন বিবাহে পশ্চাৎপদ হইলে এ অক্লেশেই আরোও নানারূপ মিথ্যা কলঙ্ক আমার নামে সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করিতে পারে। তাহা হইলে পৃথিবীতে আমার আর মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না। এখন পুরাতন বন্ধুর সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া অবিলম্বে সৎপরামর্শ দানে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর। ইতি—

বশংবদ

শ্রীদুর্গাদাস বসু।

(১৮)

কানপুর,

প্রিয় দুর্গাদাস! ২রা ভাদ্র ১৩২১।

যাহা হউক তোমার যে বুদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছে,

ইহাতেই ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বড়ই বিলম্বে। কিন্তু কেলেঙ্কারী হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। জীবনের তৃতীয়াংশকাল স্ত্রীলোকের সহিত থাকিয়া এবং ঘটনাচক্রে বহু স্ত্রীলোকের সম্পর্কে আসিয়া যেটুকু স্ত্রী চরিত্র বুঝিয়াছি, তাহাতে তোমাকে নিশ্চয় বলিতে পারি কিছু অর্থ পাইলেই এই স্ত্রীলোক তোমাকে সমস্ত কেলেঙ্কারী হইতে রেহাই দিবে। ইহা ব্যতীত তোমার তো আরও এক সহজ উপায় রহিয়াছে,—যদি সত্যই এ বালিকা সদবংশের হয়, যদি সত্যই দারিদ্র্য তাড়নে ইহার এই অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি অনায়াসে ইহার সহিত তোমার নাতির বিবাহ দিতে পার। সত্যই তাহা হইলে সমাজের এক মহৎ উপকার করা হইবে। ইহাতে তোমার বন্ধুবর্গের নিকটেও হাস্যাস্পদ হইতে হইবে না এবং বিবাহে উপস্থিত হইয়া তোমার পরিবর্ত্তে তোমার নাতিকে দেখিয়া তাহারা এ রহস্যে প্রচুর আনন্দভোগ করিবে। তোমার পক্ষে এ কার্য্য অতি সহজেই হইতে পারে, কারণ তোমার বিপুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিলে

কিছুতেই সে তোমার অবাধ্য হইতে পারিবে না। তবে নির্ব্বুদ্ধিতার দণ্ডস্বরূপ যে দিকেই হউক তোমার কিছু ব্যয় হইবে। ইতি—

বশংবদ

শ্রীমথুরচন্দ্র দাস।

(১৯)

কলিকাতা,

৫ই ভাদ্র ১৩২১।

প্রাণের সই!

এদিকে এক মজার ব্যাপার ঘটিয়াছে। ঠাকুরদাদা মহাশয় আমাকে কিছু ঘুষ দিয়া বিবাহ হইতে নিষ্কৃতি চান। সহসা এরূপ মতের পরিবর্ত্তন হইবার কারণ কি, ব্যাপারটা তোমায় খুলিয়াই লিখি। কাল যখন আমি বুড়োর ঘর পরিষ্কার করিতেছিলাম,—বুড়ো ঘুমাইতেছে ভাবিয়া আমার স্বামী নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিয়া চুপি চুপি আমার পশ্চাৎ হইতে আমাকে চুম্বন করেন। যখন আমরা পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ, সেই সময় পালঙ্কের দিকে নজর পড়ায় দেখি বুড়ো অবাক হইয়া ফ্যাল ফ্যাল চোখে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছেন। আমার

স্বামীতো এই দেখে বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহ হইতে চম্পট ;— আমিতো লজ্জায় আড়ষ্ট। বুড়ো কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ না করিয়া, তাহাকে বিবাহ হইতে নিষ্কৃতি দিতে বলিলেন। এবং এই বিবাহের কথা গোপন রাখিবার জন্য আমাকে যথেষ্ট ঘুষ দিতেও চাহিয়াছেন।

বুড়োকে তাহার এই অলীক বিবাহের ধারণা হইতে নিষ্কৃতি দিতে আমি পরম আহ্লাদের সহিত সর্ব্বদাই রাজী। টাকাটা লইবার উপায় থাকিলে এরূপ টানাটানির সময় লোভ সম্বরণ করিতে পারিতাম কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু বড়ই ঘৃণার বিষয় যে, ঠাকুরদাদা মহাশয় আমাকে অতি নীচ, চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক ভাবিয়াছেন এবং আমার ন্যায় চরিত্রহীনা তাঁহার স্ত্রী হইবার একেবারেই উপযুক্ত নয় বলিয়া আমাকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়া বিবাহ হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছেন। কিন্তু এ দিকে আসল কথা প্রকাশ করিবারও উপায় নাই। আমার স্বামী বাটী ফিরিলেই অতি অবশ্য যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে, সে কথা তিনি আমাকে বলিতে বলিয়াছেন। বুড়ো নিশ্চয়ই আমার স্বামীকে বলিবে, আমি অতিশয় কুচরিত্রা

ও অর্থলোলুপ স্ত্রীলোক, এরূপ স্ত্রীলোককে এক মুহূর্ত্তেও বাটীতে স্থান দেওয়া উচিৎ নয়, অবিলম্বে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হউক। কি যে করি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না,—মহা মুস্কিলে পড়িয়াছি। ইতি—

তোমার সই—বীণাপাণি।

পুঃ—উদ্দেশ্য মন্দ না হইলেও প্রতারণা করা বড়ই বিপদজনক। ইহা আমি নিজের উপর দিয়াই বেশ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি।

(২০)

কলিকাতা,

৭ই ভাদ্র ১৩২১।

প্রিয় পরেশ!

আজ এক তোমায় মজার খবর লিখিতেছি! আজ দুই দিন হইল আমার একখানা বড় ছবি বিক্রয় হওয়ায় সেই আনন্দ-সংবাদটা বীণাকে দিবার জন্য তাহার সন্ধানে এ ঘর সে ঘর ঘুরিয়া দেখি সে ঠাকুরদাদার ঘর পরিষ্কার করিতেছে। বুড়ো ঘুমাইতেছে ভাবিয়া আমি বীণাকে চমকিত করিবার জন্য নিঃশব্দে পশ্চাৎ হইতে যাইয়া

তাহার গণ্ডে চুম্বন করি। কিন্তু বুড়ো ঘুমায় নাই, দেখি মিট্‌মিট্‌ করিয়া চাহিতেছে ;—দেখিবা মাত্রতো আমি তৎক্ষণাৎ সে গৃহ ছাড়িয়া একেবারে বাটীর বাহিরে। তারপর যখন সন্ধ্যার সময় বাটী ফিরিলাম তখনতো বুড়ো আমায় ডাকিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা। "স্ত্রীলোককে চুম্বন করা কত বড় গুরুতর অপরাধ, এই চুম্বন হইতে কত রকম পাপের অনুষ্ঠান হইতে পারে—কত রকম রোগের বীজাণুর আক্রমণ হইতে পারে ইত্যাদি।" আমি তো বর্ণ পরিচয়ের সুবোধ বালক গোপালের মত অবনত মস্তক ; মুখে একটীও কথা নাই। শেষে বলিলেন, যখন তুমি এই স্ত্রীলোককে চুম্বন করিয়া উহার মর্য্যাদা নস্ট করিয়াছ, তখন তোমায় উহাকে বিবাহ করা উচিত। আর তুমি যে পাপ করিয়াছ ; বিবাহই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। আমি ভাবিয়াছিলাম একবার বলি, আপনি যখন বলিতেছেন তখন আর উপায় কি—ইত্যাদি। আর বুড়োর পয়সায় পুনরায় আর একবার বেশ জাক জমকের সহিত বীণাকে বিবাহ করি, কিন্তু বীণা কিছুতেই রাজী হইল না, সে বলে অনেক প্রতারণা করা হইয়াছে, এবার

সব কথা প্রকাশ করিতেই হইবে ;—তাহাতে যে ফলই হউক না কেন। কাজে কাজেই বুড়োকে সব কথা বলিতে হইল। আমরা পূর্ব্ব হইতে বিবাহিত শুনিয়া কিছুক্ষণ বুড়োতো বিস্ময়ে আমাদের উভয়ের মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে বৃদ্ধ হঠাৎ উল্লাসিতের ন্যায় সহাস্যে বলিলেন, "আমি যদি তোমার জন্য পাত্রী পছন্দ করিতাম তাহা হইলে এই পাত্রীকেই পছন্দ করিতাম।" আমরা যা ভয় করিয়াছিলাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তখনি মাসহারা ডবল হইয়া গেল এবং বিবাহের জন্য যে সকল অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়াছিল, আমাদের বিবাহের যৌতুক স্বরূপ সে সমস্তই বীণাকে প্রদান করিয়াছেন। এতদিন পরে নিশ্চিন্তে বীণাকে বক্ষে তুলিয়া লইতে পারিলাম। ইতি—

তোমার—গণেশ।

দিগম্বর।

১

"ভুল সম্পূর্ণ ভুল !"

অতি বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মহা আবেগে নলিনবিহারী এই কয়েকটী কথা বলিয়া ফেলিলেন। নানা-বিধ মিষ্টান্নপূর্ণ রেকাবী হস্তে তাঁহার দশম বর্ষিয়া শ্যালিকা লাবণ্যপ্রভা সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি ভুল জামাই বাবু ?"

নলিনবিহারীর কর্ণে বোধ হয় সে কথা প্রবেশ করিল না, তিনি নিজ মনে বলিতে লাগিলেন, "স্বভাবের সৌন্দর্য্য,—তীর্থ পর্য্যটন,—ঈশ্বরের অসীম অনন্ত প্রেম পরিত্যাগ করিয়া সংসারে থাকিবার অর্থ কি,—তাৎপর্য্য কি,—প্রয়োজন কি ?"

এবার লাবণ্য তাহার স্বর একটু উচ্চে তুলিয়া বলিল, "কিসের প্রয়োজন কি, জামাই বাবু ?"

নলিনবিহারী অতি বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "বিয়ের —বুঝলে—বিয়ের !"

লাবণ্যপ্রভা, জামাই বাবুর ভাবে ও কথায় অতি কষ্টে অঞ্চলে বসনাবৃত করিয়া হাসি দমন করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে বিষয় পরে মিমাংসা করিলেই চলিবে, এখন নিন্ এই জল খাবার খান।"

নলিনবিহারী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "বিবাহ জিনিষটা স্পষ্টই দেখা যাই-তেছে, অনেকটা জাঁতার ন্যায়। জাঁতায় যেরূপ হস্ত পদ পড়িলে পেষিত হইয়া যায়;—বিবাহরূপ কলেও একবার মস্তক গলাইলে দেহের সমস্ত অস্থি-মর্য্যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। জাঁতায় যেরূপ মুগ ছোলা অড়হর প্রভৃতিকে ডালে পরিণত করে, বিবাহেও সেইরূপ মানুষকে ভেড়া প্রভৃতি নানাবিধ জীবে রূপান্তরিত করে। পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে;—কেন? বিবাহ করিয়াছি,—তাহার ফলস্বরূপ পুত্র কন্যা হইয়াছে,—প্রতিপালন করিতে হইবে। বাঁচিতে হইবে কেন? বিবাহ করিয়াছি,—স্ত্রী অনাথ হইবে। এমন যে মাধুরী-মোহন বিবাহ তাহাই করিতে আমরা উন্মত্ত, অথচ সভ্য জীব বলিয়া আমরা

জগতে পরিচয় দিই। ধিক! শত ধিক! আর অন্য দিকে লাঞ্ছনা নাই, প্রবঞ্চনা নাই, পরিশ্রম নাই, চিন্তা নাই;—আছে কেবল প্রাণভরা নির্ম্মল আনন্দ! বৃক্ষ ফল আহার, নির্ঝরিনীর নির্ম্মল জলপান, চন্দ্র সূর্য্যের আলোক, উন্মুক্ত বাতাস! না আর না,—বিলম্বে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এস,—এস আমার প্রাণে, এস আমার মনে, এস আমার দেহের শিরায় শিরায় জগৎ পিতার সেই অসীম অনন্ত প্রেম!"

সহসা জামাই বাবুর মস্তিস্ক বিকৃত হইল ভাবিয়া লাবণ্য এতক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল;—জামাই বাবুকে নীরব হইতে দেখিয়া বলিল, "হঠাৎ মাথা গরম হ'লো কেন? পেটে কিছু দিন, এখনি মাথা ঠাণ্ডা হবে।"

"না আর না,"—এই বলিয়া নলিনবিহারী একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "এত দিনে বুঝিয়াছি সব মিথ্যা,—তুমিই একমাত্র সত্য। হে ঈশ্বর, জগৎ স্বামিন, আজ হইতে তোমার পবিত্র নামে বিভোর হইয়া পথে পথে, মাঠে, মাঠে, অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব।" শেষ

এই কয়টী কথা বলিতে বলিতে অতি ধীরে নলিনবিহারী তাঁহার শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিলেন।

"জামাই বাবু কোথায় যান, কোথায় যান," বলিয়া লাবণ্য বাহির বাটী পর্য্যন্ত আসিল, কিন্তু সে কথা নলিন-বিহারীর কর্ণে পৌঁছিল না।

২

শান্তিপুরের মধ্যবিদ গৃহস্থ রসময়বাবুর একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। পুত্রের নাম হেমেন্দ্র, কন্যা দুইটীর মধ্যে জেষ্ঠ্যের নাম অমীয়প্রভা, আর কনিষ্ঠের নাম লাবণ্যপ্রভা। নলিনবিহারী যখন ওকালতী পাশ করিয়া স্বদেশ অর্থাৎ বরিশাল জজ আদালতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন; সেই সময় প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে রসময়বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা অমীয়প্রভার সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। আজ প্রায় ছয় সাত মাস বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু নানা কারণে বহুবার আহ্বান সত্ত্বেও বিবাহের পর নলিনবিহারীর আর শ্বশুরালয়ে আগমন ঘটে নাই। পূজায় দীর্ঘ অবকাশ পাইয়া এই প্রথম তিনি তাঁহার নব পরিণীতা

ভার্য্যার অধর সুধাপান করিতে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়াছেন। প্রথম জামাই শ্বশুরালয়ে আসিলে তাহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই একটা রীতিমত ব্যবস্থা হইয়া থাকে। নলিনবিহারীও তাহা হইতে বঞ্চিত হন নাই ;—শান্তিপুর বলিয়া বরং ইহার মাত্রা আরও গুরুতর হইয়াছিল। আসন, স্থান, বস্ত্র পরিবর্ত্তন হইতে আহারের প্রতি পদে পদে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহার আত্মসংযম দুর্ঘট হইলেও তিনি নীরবে তাহা সহ্য করিতেছিলেন।

সমস্ত দিন নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া রাত্রে কোন ক্রমে অর্দ্ধাহারে আহার কার্য্য শেষ করিয়া নলিনবিহারী তাঁহার শ্যালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুন্দর খাটে দুগ্ধফেননিভ শয্যা, মধ্যস্থলে একটি টুলের উপর নীলবর্ণ চিমনিতে পরিশোভিত হইয়া একটী সুন্দর কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলিতেছে। সমস্ত দিন ব্যাপী লাঞ্ছনা ও অপদস্থে ক্ষত বিক্ষত নলিনবিহারী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া একটা আশস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শয্যার এক পার্শে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। "জামাইবাবু পান

খান দিদি আস্‌ছে,” বলিয়া লাবণ্য হাসিতে হাসিতে গৃহের বাহির হইয়া গেল।

নলিনবিহারীর আনন্দে হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। স্ত্রীকে প্রথমে কি সম্ভাষণ করা উচিত, কি ভাবে আলাপ সুরু করা কর্ত্তব্য, এই সকল নানা চিন্তা এক সঙ্গে নিমিষে তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিয়া মস্তক আলোড়িত করিয়া দিল। শত সহস্র সোহাগের সম্ভাষণ পরে পরে আসিয়া তাঁহাকে গোলক ধাঁধাঁয় ফেলিয়া দিল। কোনটা বাদ দিয়া কোনটা গ্রহণ করা উচিত, কোনটার মিষ্টতা অধিক, কোনটা শ্রুতি মধুর, তাহা স্থির করিতে তাঁহাকে গলদঘর্ম্ম করিয়া তুলিল। সহসা বাহিরে মলের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করায়, এতক্ষণ বহু গবেষণায় নলিনবিহারী যাহা কিছু স্থির করিয়াছিলেন সমস্তই তাঁহার গুলাইয়া গেল। মলের শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বক্ষঃ স্পন্দন আরো বৃদ্ধি হইল। লাবণ্য টানিতে টানিতে আনিয়া এক শুভ্র কালা পাছাপেড়ে সাড়ীতে আপাদমস্তক আবরিত দেহকে গৃহের ভিতর রাখিয়া বাহির হইতে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সমস্তদিন ব্যাপী লাঞ্ছনা অকাতরে যাহার চন্দ্রবদন দেখিবার জন্য নলিনবিহারী নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার অন্তর-নিহিত সমস্ত প্রেম একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহার চির-বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে হৃদয়ে টানি আনিয়া অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "প্রিয়ে অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর। দেখ তোমার বিরহরূপ ভূমিকম্পে আমার হৃদয়রূপ হর্ম্ম্য চূর্ণ বিচূর্ণ!"

বধু নীরব! "কিসের লজ্জা," বলিয়া মহা সোহাগে নলিনবিহারী তাহার অবগুণ্ঠন স্বহস্তে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গৃহের প্রতি গবাক্ষ ও দ্বারের পার্শ্ব হইতে খীল খীল শব্দে হাসির তরঙ্গ উঠিল। পত্নীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া নলিনবিহারী একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। এতো তাহার স্ত্রী নয়। এ যে পুরুষ-বালক। এরূপ অপদস্থ তিনি জীবনে কখনও হন নাই। দুঃখে ক্ষোভে, লজ্জায় মরমে মরিয়া হতাশ ভাবে নলিনবিহারী একেবারে শয্যা গ্রহণ করিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত লাঞ্ছনা যেন এক সঙ্গে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল ;—

তাঁহার বিবাহের উপর মর্ম্মান্তিক ঘৃণা হইয়া গেল।

এদিকে বাহু বন্ধন শীথিল হওয়ায় বধূরূপী বালক হাসিতে হাসিতে গৃহ হইতে পলায়ন করিল। পরক্ষণেই নলিনবিহারীর ত্রয়োদশ বর্ষিয়া বালিকা বধূ গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহের অর্গল ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া অতি সঙ্কোচিত ভাবে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল। তখনও বাহিরে হাসির শব্দ তপ্ত লৌহ শলাকার ন্যায় নলিনবিহারীর কর্ণে প্রবেশ করিতে ছিল। আবার অপদস্থ হইবার ভয়েই হউক, অথবা বিবাহের উপর আর শ্রদ্ধা না থাকাই হউক, যে কারণেই হউক তিনি আর পাশ ফিরিলেন না, বালিশের ভিতর মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিলেন। দুঃখে তাঁহার চক্ষে জল আসিতেছিল।

অমীয় আজ কত আশা করিয়া স্বামীর নিকট আসিয়াছিল কিন্তু স্বামীর ভাবে হতাশ হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নলিনবিহারীর চক্ষে নিদ্রা নাই ;—যে বিবাহের প্রারম্ভে এত লাঞ্ছনা তাহার শেষ যে কি তাহা ভাবিতেও তাঁহার আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তিনি কি কষ্টে যে সে রাত্রি কাটাইয়া ছিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র তিনি একেবারে যাইয়া বাহিরের গৃহে উপবিষ্ট হইলেন। জামাতা উঠিয়াছে সংবাদ পাইয়া নলিনবিহারীর শ্বশ্রুমাতা লাবণ্যকে দিয়া বাহিরে জল খাবার পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

৩

লাবণ্য যাইয়া যখন বাটীর ভিতর সংবাদ দিল, জামাই বাবু চলিয়া গেল। তখন লাবণ্যের মাতা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সেকি, জামাই চলে গেল কেন, কোথায় গেল ?"

লাবণ্য হস্তস্থিত মিষ্টান্নের রেকাবী মাটিতে রাখিয়া বলিল, "তা জানি না মা, পাগলের মত কি বকতে বকতে চলে গেল।"

কন্যার কথা শুনিয়া জামাতার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া লাবণ্যের মাতা তখনি পুত্রকে ডাকিয়া, "নলিন কোথায় গেল" দেখিতে বলিলেন।

হেমেন্দ্র বলিল, "কোথায় যাবে, এখনি আসিবে ;—তার টাকা কড়ি সমস্তই আমার কাছে রহিয়াছে।"

পুত্রের কথায় মাতার মন প্রবোধ মানিল না, তিনি বলিলেন, "তাহ'ক তবু তুই একবার যা, দেখে আয় সে কোথায় গেল। কাল থেকে সবাই মিলে তাকে যে জ্বালাতন কচ্ছে, হয়তো সেই জন্য রাগ করে সে বাড়ী চলে গেল।"

মাতার অনুরোধে হেমেন্দ্র নলিনবিহারীর খোঁজে বাহির হইল কিন্তু চারিদিকে বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পাইল না। সকলেই তাঁহার জন্য একটু বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল।

সন্ধান না পাইবার কারণ ছিল, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় নলিনবিহারী পাকা রাস্তা ছাড়িয়া একেবারে মাঠে উঠিয়া ছিলেন। প্রভাতে মাঠের উন্মুক্ত হাওয়ায় বড় আনন্দেই তিনি ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিতে ছিলেন, কিন্তু যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই আনন্দ ক্রমেই নিরানন্দে পরিণত হইতে লাগিল। বহুদূর আসায় শরীরও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর বেলা প্রায় দুপ্রহর হইয়াছে, সূর্য্যের প্রখর কিরণ আর সহ্য করা অসম্ভব। ছাওয়ায় ক্লান্তি দূর করিবার জন্য তিনি এক
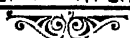
বৃক্ষ ছায়ায় উপবিষ্ট হইলেন। রাত্রে ভাল আহার না হওয়ায় ক্ষুধায় উদরও নানারূপ গোলমাল আরম্ভ করিয়া ভগবৎপথে মহা বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছিল। নলিনবিহারী একবার পকেটে হাত দিলেন, তথায় সিগারেটের প্যাকেট ব্যতীত আর কিছুই নাই। "ঈশ্বর আহার দিবেন, তাঁহার প্রেমে আমি বাহির হইয়াছি, আমার চিন্তা কি?" এই বলিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ;—কিন্তু বহু-ক্ষণ অতি বাহিত হইল ভগবান তাঁহার জন্য সেই ক্রোশ ব্যাপি মাঠের ভিতর আহার লইয়া উপস্থিত হইলেন না। সহসা তাঁহার মনে হইল, "আমি কি আহম্মুক! ঈশ্বর কাহারও জন্য আহার লইয়া স্বয়ং উপস্থিত হন না, তাঁহার নাম করিয়া যাহার নিকট যাইব সেই আহার দিবে।"

নলিনবিহারী উঠিলেন, কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে এক গোপ গৃহ দেখিলেন। গৃহের দাওয়ার উপর এক নধর অধর গোপ-শিশু খেলা করিতেছিল। তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এখানে একটু দুধ মিলিবে?"

বালক তাঁহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "ওই দিকে ভিতরে যাও।"

নলিনবিহারী স্পন্দিত হৃদয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গৃহের প্রাঙ্গণে একটি গোপ-ললনা মাখম তুলিতেছিল; তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "একটু দুধ পাওয়া যাইবে ?"

গোপ-ললনা অপরিচিত ভদ্রলোক সম্মুখে দেখিয়া একটু সঙ্কোচিত হইয়া বলিল, "কতটুকু দরকার ?"

"যে টুকু হয়।"

"কতটুকু না বল্‌লে কি করে দোব ?"

নলিনবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি ঈশ্বর প্রেমে সন্ন্যাসী হইয়াছি,—ভিক্ষাস্বরূপ দুধ চাহিতেছি;—আপনার যতটুকু দয়া হয়, ততটুকু দিতে পারেন।"

গোপ-ললনা নলিনবিহারীর কথা ও বেশের পার্থ্যক দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিলেও দয়াটুকু বেশ বুঝিল। সে তাঁহার দিকে একবার ভ্রূকুটি কুটিল নয়নে চাহিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আঃ মরণ মিন্সে! মসকরা করবার আর জায়গা পাওনি। আমরা শান্তিপুরের মেয়ে, মসকরা এখনি বার করে দেব।"

গোপ-ললনার উচ্চস্বরে কুটিরের ভিতর হইতে, "কি

হয়েছে লক্ষ্মী", বলিয়া এক অতি বলিষ্ট গোপ বাহির হইয়া আসিল।

গোপ-ললনা বলিল, "দেখ না বাপ, আমার সঙ্গে মসকরা করছে; বলছে—দয়া হবে না।"

কন্যার কথায় সেই ব্যক্তি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "তুমি কেমন ধারা ভদ্রলোক গা। দয়া হবে না,—দয়া রাস্তায় পড়ে আছে! বেরোও, এখনি—বেরোও!"

নলিনবিহারী তাহাদের ভুল বুঝাইয়া দিবার জন্য অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "অন্য দয়া নয়, আমি সন্ন্যাসী, দয়ার স্বরূপ একটু দুগ্ধ চাহিয়াছি।"

নলিনবিহারীর কথায় সেই ব্যক্তি ক্রোধে স্বর সপ্তমে তুলিয়া বলিল, "সন্ন্যাসী! জামা জুতো পরে সন্ন্যাসী! আমাদের বোকা বোঝাচ্ছেন। কেলো বাঁকটা নিয়ে আয়তো,—একবার সন্ন্যাসীগিরি ভেঙ্গে দিই।"

নলিনবিহারী স্পষ্টই বুঝিলেন এখানে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইলে সত্যই বাঁক পেটা হইবার সম্ভাবনা। মূর্খ গোয়ালা ঈশ্বর প্রেমের কি বুঝিবে মনে মনে এই ভাবিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি গোপ-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

একটা কূটবুদ্ধি যুবকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল, সে ধীরে ধীরে বলিল, "কথা যথার্থই বটে ; পারিলে সন্ন্যাসের ন্যায় আর শান্তির জিনিষ কি আছে ? তবে যখন সন্ন্যাসীই হইয়াছেন,—তখন বেশটা আপনার পরিবর্ত্তন করা উচিত।"

নলিনবিহারী একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন ! সন্ন্যাসের সহিত বেশের কোন সম্বন্ধ নাই।"

"তা নাই বটে ;—তবে লোকাচার অনুযায়ীই কার্য্য করা উচিত। তা ছাড়া সন্ন্যাসে উদর পূরণের ভিক্ষাই একমাত্র উপায় !

কথাটা নলিনবিহারীর প্রাণে লাগিল, তিনি মনে মনে বলিলেন কথাটা সত্য, প্রকাশ্যে বলিলেন, "এখন উপায় ?"

"উপায়ের আর চিন্তা কি ? নিকটেই বাজার, চলুন আমার সঙ্গে, আমি এখনই আপনাকে গেরুয়া বসন ও চাদর কিনিয়া দিতেছি।"

নলিনবিহারী বিষণ্ণস্বরে বলিলেন, "আমার কাছে তো এক পয়সাও নাই !

"তাইতো তাহা হইলে তো বড় মুস্কিলের কথা,—আমার নিকটেও সম্প্রতি এক পয়সা নাই যে কিনিয়া দিই।"

নলিনবিহারী যুবকের হাত দুইটী ধরিয়া অতি কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "মহাশয় আপনাকে যা হয় একটা উপায় করিতেই হইবে।"

যুবক একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আরতো কোনও উপায় দেখিতেছি না, তবে এক উপায় আছে, তাহাও না হয় আমি আপনার জন্য করিতে পারি! "আপনার কাপড় জামা ও জুতা আমায় খুলিয়া দিন, বাজারের অধিকাংশ দোকানদারই আমাকে চিনে, আমি ওই সকল তাহাদের নিকট বিক্রয় করিয়া আপনার গেরুয়া বসন কিনিয়া আনি।

"উলঙ্গ হইয়া? তা কিরূপে সম্ভব!"

"তা না হইলে নিরুপায়! সম্ভব নয় বা কিসে তাহাতো বুঝিতে পারি না। আমার বড় জোর এক ঘণ্টা দেরী হইতে পারে। ততক্ষণ আপনি অক্লেশে ঐ ঝোপের ভিতর বসিয়া থাকিতে পারেন।"

নলিনবিহারী মনে মনে ভাবিলেন বেশ পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে রাত্রেও অনাহারে থাকিতে হইবে, কিন্তু বেশ পরিবর্ত্তনের অন্য উপায় নাই, প্রকাশ্যে বলিলেন, "দেখবেন যেন বেশী দেরী না হয়।"

(৪)

ক্ষুধা ও পিপাশায় অর্দ্ধমৃত নলিনবিহারী অতি কষ্টে আরোও প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক প্রকাণ্ড দীঘিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে তাঁহার কণ্ঠতালু, এমন কি পাকস্থলী পর্য্যন্ত শুস্ক হইয়া গিয়াছিল। ক্ষুধায় তাঁহার সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করিতে ছিল। তিনি সেই দীঘিকায় নামিয়া জল পান করিয়া উদর ও পিপাশা কতকটা নিবারিত করিলেন। তাঁহার পা টলিতেছিল, তিনি সেই দীঘিকার তীরে এক বৃক্ষছায়ায় দুর্ব্বাদল শয্যায় একেবারে আড হইয়া পড়িলেন;—অবসন্ন দেহে নিদ্রা আসিয়া দেখা দিল,—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কতক্ষণ সেইভাবে পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই, সহসা মনুষ্য কণ্ঠস্বরে তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, বেলা প্রায় অবসান;—সম্মুখে তাঁহারই সমবয়স্ক একটী যুবক বলিতেছে, "এখানে এমনভাবে পড়িয়া আছেন কেন মশাই,—আপনার বাড়ী কোথায় ?"
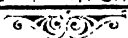
যুবকের কথায় নলিনবিহারী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি—বাড়ী ? হাঁ বাড়ী ! আমার বাড়ী পূর্ব্বে ছিল, আজ আর নাই, আজ হইতে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিযাছি।"

যুবক নলিনবিহারীকে উন্মাদ ভাবিয়া তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে ছিল, কিন্তু তাহার দেহে উন্মত্তের কোনরূপ চিহ্ন না পাইয়া বলিল, "হঠাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ কি ?"

অতি গম্ভীরভাবে নলিনবিহারী বলিলেন, "কারণ—মহা কারণ। কি কারণে এত লাঞ্ছনা, এত অপমান সহ্য করি ? কারণ—বিবাহ করিয়াছি। পরিশ্রম করিয়া,—প্রাণপাত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে ? কারণ—বিবাহ করিয়াছি। আর সন্ন্যাসে লাঞ্ছনা নাই,—প্রবঞ্চনা নাই—পরিশ্রম নাই, ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন, তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন, পবিত্র নির্ঝরিণীর জল পান, আর বৃক্ষ ফল আহার।"

যুবক মনে মনে বলিল, "ঈশ্বরের রাজ্যে কত প্রকার উন্মাদ আছে, তাহার ভিতর এই এক প্রকার।" সহসা

যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, "পাগল হয়েছেন! আপনাকে উলঙ্গ অবস্থায় রাখিয়া যাইতেছি, দেরী করিতে পারি,—যাইব আর আসিব।"

যুবক একটু দূরে যাইয়া দাঁড়াইলেন,—নলিনবিহারী একে একে জুতা জামা কাপড় তথায় খুলিয়া সম্মুখস্থ ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঝোপের ভিতর হইতে গলা বাহির করিয়া তিনি আবার বলিলেন, "দেখিবেন যেন দেরী না হয়!"

"কোন ভয় নাই,"—বলিয়া যুবক ধীরে ধীরে নলিন-বিহারীর জুতা জামা কাপড় তুলিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

(৩)

নগ্নদেহে ঝোপের ভিতর পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র কীটের মৃদু মধুর দংশন ক্রমেই নলিনবিহারীর অসহ্য হইয়া উঠিতে ছিল। যুবক এখনি আসিবে এই আশায় তিনি বহু কষ্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন কিন্তু সূর্য্য ডুবিয়া সন্ধ্যা হইয়া গেল, তথাপি

যুবকের দর্শন নাই। শেষ নলিনবিহারী যুবকের আগমন বিষয়ে একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজের সেই বিভৎস উলঙ্গ দেহের প্রতি চাহিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "না যুবক আর আসিবে না,—পৃথিবী প্রবঞ্চনাময়! এখন উপায়?"

সমস্ত দিন অনাহারে, নগ্নদেহে, উন্মুক্ত বক্ষে ঝোপের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা প্রভৃতি নানারূপ জীবের ক্রমান্বয় দংশনে তিনি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও মহিমা দেহের প্রতি শিরায় শিরায় উপলব্ধি করিতে ছিলেন। এ যন্ত্রণা হইতে শ্বশুরালয়ের লাঞ্ছনা যে সহস্রগুণ ভাল,—এই কথাই তখন বার বার তাঁহার মনে উদয় হইতে ছিল। গৃহের লাঞ্ছনার সহিত সন্ন্যাসের লাঞ্ছনা তুলনা করিয়া তাঁহার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিতে ছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু দূরে দুইজন গ্রাম্য-ললনা আসিতেছে দেখিয়া লজ্জায় তাড়াতাড়ি আবার ঝোপের ভিতর লুক্কাইত হইলেন।

সন্ধ্যার একটু পরেই প্রবলবেগে বৃষ্টি নামিল। আশ্বিন মাসের শেষ,—শীতের বেশ একটু আমেজ পড়িয়াছে,—

তাহার উপর বৃষ্টি! শীতে নলিনবিহারীর সমস্ত শরীর বরফে পরিণত হইতে লাগিল, তাঁহার সমস্ত দেহে খীল ধরিতেছিল। সহসা ঝোপের ভিতর সড় সড় শব্দ হওয়ায় তিনি একেবারে লম্ফ দিয়া ঝোপ হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শেষ কি সর্পের দংশনে মাঠের মাঝে প্রাণ দিতে হইবে? তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় আর অধিকক্ষণ থাকিলে সর্প দংশনে না হইলেও অনাহারে মৃত্যু সুনিশ্চিত। উপায়ই বা কি? অপরিচিত দেশে এরূপ অবস্থায় যানই বা কোথায়? অধিকক্ষণ চিন্তা করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আর ছিল না—শেষ তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে শ্বশুরালয়ের দিকেই রওনা হইলেন।

চারিদিক ঘোর অন্ধকার,—তখনও টিপি টিপি করিয়া বৃষ্টি পড়িতে ছিল, পথ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ। ইটে ও কাঁটায় তাঁহার সমস্ত পদ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। দুই একটা গ্রাম্য কুকুর তাঁহার উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখিয়া চীৎকার করিয়া যেন তাহার মূর্খতার জন্য বিদ্রূপ করিতে লাগিল। দুই তিন বার তাঁহাকে মনুষ্য পদশব্দে পথ ছাড়িয়া ঝোপের

ভিতর লুকাইত হইতে হইল। এইরূপ ভাবে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল হাটিয়া নলিনবিহারী লজ্জায় দুঃখে ক্ষোভে মৃতপ্রায় হইয়া বীভৎস উলঙ্গ মূর্ত্তিতে শ্বশুরালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাহাকেও ডাকিতে তাঁহার সাহস হইল না, দ্বারের নিকট যাইয়া ধীরে ধীরে কড়া নাড়িতে লাগিলেন।

বাহিরের গৃহেই হেমেন্দ্র শুইয়া ছিল। সমস্ত দিন নলিনবিহারীর কোন সন্ধান না হওয়ায় সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহারা নলিনবিহারীর আগমন প্রত্যাশা করিতে ছিলেন। দ্বারে কড়ার শব্দ হওয়ায় হেমেন্দ্র আলো লইয়া সত্বর আসিয়া দরজা খুলিল। সম্মুখে উলঙ্গ মূর্ত্তি নলিনবিহারী! সে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! একি মূর্ত্তি? কাপড় কোথায়?"

নলিনবিহারী ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "আগে আমায় কাপড় আনিয়া দাও। কাপড় খোয়া গিয়াছে।"

"এমন আহাম্মুখও আছে, কাপড় খোয়া গেল?" এই বলিয়া হেমেন্দ্র সত্বর যাইয়া একখানা কাপড় ও একখানা

আলোয়ান আনিয়া তাহাকে দিল। কাপড় পরিয়া আলোয়ানে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া লজ্জায় অবনত মস্তকে নলিন-বিহারী হেমেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। হেমেন্দ্র বলিল,—"মা এই নাও তোমার নেংটা বাবা,—এতক্ষণে ফিরেছেন।"

নলিনবিহারী কোন কথা না বলিয়া একেবারে শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। শয্যায় পড়িয়া তিনি যেরূপ আরাম উপলব্ধি করিলেন, পূর্ব্বে তিনি জীবনে কখনও সেরূপ আরাম উপলব্ধি করেন নাই। মনে মনে বলিলেন, "এরূপ শয্যা থাকিতে বৃক্ষতল? কি ভুলই করিয়াছিলাম।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার উলঙ্গ মূর্ত্তির কথা বাটীময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। লাবণ্য হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "কি জামাই বাবু, ঈশ্বর প্রেম কেমন লাগ্‌লো? শিবত্ব পাবেন ব'লে বুঝি দিগম্বর হয়েছিলেন?"

নলিনবিহারী নীরব,—তাহার মুখে বাক্য নাই। ঈশ্বর প্রেম তখন তাঁহার মাথায় উঠিয়াছে।

উল্‌টো-বিপদ।

"কার চিঠি গা ?"

ললিতভূষণ প্রভাতকালে তাঁহার বাহিরের গৃহে একাকী বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে একখানি চিঠি পড়িতে ছিলেন সেই সময় তাঁহার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী, হৃদয়প্রভা কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানা কার চিঠি গা ?"

ললিতভূষণ চিঠি হইতে দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত করিয়া, চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "এ খানা চিঠি নয়, একখানা বিল।"

"কোন পাওনাদারের বুঝি ?"

"না কোন পাওনাদারের নয়,—বাবার !"

হৃদয়প্রভা একটু বিস্মিত হইয়া হাসিয়া বলিল, "বাবার বিল ? বাবা কি তোমার উপর কোন দাবী করে বিল পাঠিয়েছেন ?"

ললিতভূষণ বলিলেন, "হাঁ সেই রকমই কতকটা বটে, এই শোন, একখানা চিঠিও লিখেছেন ,—

প্রিয় ললিত !—

তুমি বোধ হয় অস্বীকার করিবে না যে, তোমাকে মানুষ করিতে বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়াছে। আশা করি

এক্ষণে আমার সেই প্রাপ্য টাকাটা অবিলম্বে শোধ করিবে। এই পত্রের নিম্নে হিসাব পাঠাইলাম, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে, কেবল মাত্র যাহা আমার ন্যায্য ব্যয় হইয়াছে, তাহাই ধরিয়াছি ; সুদ প্রভৃতি অন্য কিছুই ধরা হয় নাই। তোমার সহিত আমার অসদ্ব্যবহার করিবার ইচ্ছা নাই ;—তুমি কিস্তিবন্দি করিয়া টাকা দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীঅনাদি ভূষণ।

হিসাব।

দ্বিতীয় বৎসর হইতে পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত গড়ে
মাসিক—২৲ টাকা হিসাবে —৯৬৲ টাকা

ষষ্ঠ বৎসর হইতে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত গড়ে
মাসিক—৫৲ টাকা হিসাবে —৩৬০৲ টাকা

দ্বাদশ বৎসর হইতে পঞ্চবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত গড়ে
মাসিক—১০৲ টাকা হিসাবে —১৬৮০ টাকা

পাঠ্যের ব্যয় —১০০০ টাকা

ডাক্তার ঔষধ প্রভৃতি —৫০০৲ টাকা

মোট—৩৬৩৬৲ টাকা

পুঃ—

প্রথম বৎসর ধরা হয় নাই, কারণ তখন তুমি তোমার প্রসূতীর স্তন্য-দুগ্ধ পান করিয়াছিলে।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া ললিতভূষণ বলিলেন, "বাবার পত্রতো শুনলে, এখন এ পত্রের উত্তর আমি কি দিই ?"

হৃদয়প্রভা পত্র শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, বলিল, "এ পত্রের আর উত্তর দিবে কি ? বাবার টাকা টাকা রোগ !"

ললিতভূষণ বলিলেন, "বাবার টাকা টাকা একটা রোগ আছে, তাহা আমি জানি। তবু এর একটা উত্তর দেওয়া উচিত। এর উত্তরে আমি লিখিব যে, এ ঋণ আমার নাবালক অবস্থায় হইয়াছে, সুতরাং এ ঋণের জন্য আইনানুসারে আমি দায়ী নহি।"

ললিতভূষণ গত বৎসর বি, এল, পাশ করিয়া আলিপুর কোর্টে ওকালতি করিতেছেন, তাঁহার দাদা মহাশয় ওই কোর্টের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন, উপস্থিত তিনি কাশীবাসী হইয়াছেন। দাদা মহাশয়ের মক্কেল-দিগকে পাইয়া ললিতভূষণ অল্পে অল্পে আপনার প্রতিপত্তি

প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে ছিলেন। দুই দিবস পরে ললিতভূষণ আদালত হইতে আসিয়া বিমন ভাবে হৃদয়প্রভাকে বলিলেন, "বাবা পত্রের উত্তর দিয়াছেন,—কি লিখিয়াছেন শোন।"

প্রিয় ললিত !—

তোমার পত্র পাইয়া আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম, আমি যখন তোমায় মানুষ করিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছিলাম, তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এমন অকৃতজ্ঞ পুত্র মানুষ করিতেছি। আমি কেবল স্নেহের খাতিরে সুদ কিংবা টাকার অন্য লাভ ধরি নাই, কিন্তু তুমি এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমার ন্যায্য প্রাপ্যকেই একেবারে অস্বীকার করিতেছ। তোমার আচরণে আমি যথার্থই মর্ম্মাহত হইয়াছি। এই পত্রের দ্বারা আমি তোমাকে শেষ জানাইয়া রাখিতেছি, যদি তুমি আমার প্রাপ্য টাকা না দাও, তাহা হইলে আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিব না, বুঝিব আমার সন্তান ছিল না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীঅনাদিভূষণ।

হৃদয়প্রভা পত্র শুনিয়া বিস্মৃত ভাবে বলিল, "সত্যই কি তিনি তা কর্ত্তে পারেন ?"

ললিতভূষণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "টাকা না দিলে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, কাজেও নিশ্চয়ই তাহা করিবেন। এখন উপায় কি ? দাদা মহাশয়কে একখানা পত্র লিখে দেখি, তিনি কি পরামর্শ দেন।"

২

ললিতভূষণের নিকট হইতে পত্রের উত্তর না পাইয়া অনাদিবাবু দিন দিন তাঁহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিতে ছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বাহিরের গৃহে বসিয়া যখন তিনি উদ্‌গ্রীব চিত্তে ললিতভূষণের পত্রের অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে অনাবশ্যক হইলেও এক এক বার তেজারতির হিসাবের খাতাগুলি উল্টাইতে ছিলেন,—সেই সময় ভৃত্য আসিয়া একখানি রেজিষ্টারি পত্র তাঁহার হাতে দিল। ললিতভূষণের নিকট হইতে কোনরূপ "ব্যাঙ্ক নোট" বা "চেক" আসিয়াছে আশা করিয়া মহা ব্যগ্রভাবে অনাদিবাবু খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন,

কিন্তু পত্র পড়িয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। পত্রে লিখা ছিল ঃ—

প্রাণাধিক অনাদি ভূষণ!

বহু দিবস তোমার কোন সংবাদ পাই নাই, আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। আপাততঃ আমার কিছু টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। বহু দিবস যাবৎ আমার অনেকগুলি টাকা তোমার নিকট পড়িয়া আছে, হঠাৎ সে কথা মনে পড়ায় তোমাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। টাকাগুলি যত শীঘ্র পার পরিশোধ করিবে। ইতিঃ—

তোমার—বৃদ্ধ পিতা।

হিসাব

খাদ্য ব্যয়, পাঠ্যব্যয়, ডাক্তার ও অন্যান্য ব্যয়

২১ বৎসর পর্য্যন্ত	—৩০০০ টাকা
সুদ শতকরা ১২ টাকা হিসাবে	—৩৬০০ টাকা
	মোট—৬৬০০ টাকা

পুঃ—

ন্যায্য পক্ষে সুদের সুদ ধরা উচিত, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পত্তির জন্য—আমি তাহা ধরি নাই।

অনাদিবাবু পত্র পাঠ শেষ করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কি ? বাবার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে, বৃদ্ধ বয়সে শেষ উন্মাদ হইলেন ? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ কথা বিশেষ ভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া আমার সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য।"

অনাদিবাবু সেই রাত্রেই পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্য কাশীধামে রওনা হইলেন।

৩

পুত্রকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ চক্ষু হইতে চশমা নামাইয়া বলিলেন, "এই যে অনাদি—এস, খবর সব ভালো ? তুমি চিঠি পেয়েই এসেছ,—ভাল, ভাল টাকা কড়ির কাজ যত শীঘ্র মেটে ততই ভালো।"

অনাদিবাবু পিতার কথায় বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "টাকা ! কিসের টাকা ? আর আপনি সে টাকার আশা কেমন করে করেন ? সে ঋণ আমার নাবালক অবস্থায় হইয়াছিল, তা ছাড়া সে ঋণ বহুদিন তামাদি হইয়া গিয়াছে।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয় তা আমি জানি। তবে কি জান, তোমার কাছে বলেই আমি এ টাকার তাগাদা করি নাই। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস ছিল আমার পুত্র কখনও জুয়াচোর হইবে না।"

ক্রুদ্ধ অনাদিভূষণ উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি জুয়াচোর, এ কথা কেহ বলিতে পারে না; আমি কাহারও এক পয়সা ন্যায্য পাওনা রাখি না।"

বৃদ্ধ চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া গুড়গুড়ির নলটা মুখ হইতে বাহির করিয়া বলিলেন, "তবে কি তুমি বলিতে চাও, এ তোমার ন্যায্য ঋণ নয়। আমি আশা করি নাই যে, তুমি তোমার পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে এরূপ অন্যায় আপত্তি করিবে। তবে না দাও,—সে ভিন্ন কথা।"

অনাদিবাবু তাঁহার পিতার কথার কোন উত্তর দিলেন না, নীরবে বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "টাকা দেওয়া না দেওয়া সে তোমার ইচ্ছা, এখন আর একটা কাজ করিতে পারিবে কি?"

অনাদিবাবু দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কবে আমি আপনার কোন কাজ করি নাই?"

"ভাল তাহা হইলে বাড়ী যাইবার সময় কলিকাতায় আমার এটর্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়া যাইবে যে, আমি একটা নূতন উইল করিব, আমার সঙ্গে শীঘ্র যেন তিনি একবার সাক্ষাৎ করেন ?"

অনাদিবাবু বিস্মৃত হইয়া বলিলেন, "নূতন উইল ?"

বৃদ্ধ বলিলেন "হাঁ, একখানা নূতন উইল করিব স্থির করিয়াছি। পুরাতন উইলখানা পরিবর্ত্তন করিয়া আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই ললিতকে দিয়া যাইব ভাবিতেছি।"

"ললিতকে সব দিবেন, আর আমাকে কিছুই দিবেন না এটা কি পিতার ন্যায্য কাজ হইবে ?"

"আইনানুসারে যখন তোমার উপর আমার কোন দাবী নাই, তখন আমার উপরও তোমার কোন দাবী নাই। তুমি আমার ন্যায্য টাকা না দিলে কেন আমি এমন অকৃতজ্ঞ পুত্রকে আমার কষ্টার্জ্জিত অর্থ দান করিব !"

"এ আপনার মহা অন্যায়। আর অত টাকা আমি কোথায় পাইব ?"

"আমি তোমার অবস্থা ভালরূপই জানি,—তুমি তেজা-

রতি কারবারে আমাপেক্ষা অনেক ধনবান্ হইয়াছ। তাহা ছাড়া আমার মৃত্যুর পর আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই তুমি পাইবে।"

"আপনি এখনও বহুদিন বাঁচিবেন, দেখুন আমার কত টাকার সুদ মারা যাইবে।"

"তবে তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই কর," এই বলিয়া বৃদ্ধ রামায়ণ পাঠ করিতে লাগিলেন। অনাদি-বাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিলেন, বৃদ্ধ আর বেশী দিন বাঁচিবে না তার পরতো সবই আমার। তিনি তাঁহার পকেট হইতে 'চেক' বই বাহির করিয়া বলিলেন, "দোয়াত কলম কোথায়?"

বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখস্থ বাক্স হইতে দোয়াত কলম বাহির করিয়া দিলেন। অনাদিবাবু কলম লইয়া লিখিতে যাইয়া নিরস্ত হইয়া বলিলেন, "আমি সমস্ত টাকা একেবারে শোধ করিয়া দিতেছি, ন্যায্য মতে নিশ্চয়ই কিছু ছাড় পাইব।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এ টাকা হইতে আমি এক পয়সাও ছাড়িতে পারিব না।"

অনাদিবাবু বিশেষ দুঃখ ও বিরক্তির সহিত চেকখানা সই করিয়া দিয়া বলিলেন, "একটা রসিদ দিন।"

বৃদ্ধ রামায়ণ বন্ধ করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই রসিদ দিব বই কি! স্ট্যাম্প সঙ্গে আনিয়াছ কি? না আনিয়া থাক পয়সা চারিটা দাও, আমি স্ট্যাম্প দিতেছি।"

"অনাদিবাবু বিশেষ বিরক্তির সহিত বলিলেন, স্ট্যাম্পের পয়সা আমি দিব কেন?"

"ভাল সামান্যের জন্য গোলযোগের প্রয়োজন নাই; আমিই দিতেছি।"

অনাদিবাবু রসিদ লইয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বিকৃতমুখে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা আমরা বর্ণনা করিব না।

* * * *

এই ঘটনার দুই দিবস পরেই ললিতভূষণ তাঁহার দাদা মহাশয়ের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন,—পত্র পাঠ করিয়া আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি

হৃদয়প্রভাকে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দাদা মহাশয় পত্রের উত্তর দিয়াছেন শোন—"

প্রাণাধিক ললিত,—

তোমার পত্র পাইলাম। আশা করি তুমি ভাল আছ। আমার আদরের ও স্নেহের দিদিমনির যত্নে বোধ হয় তোমার কোন অসুখ নাই। কয়েক দিন হইতে আমার একটা পড়তি টাকা আদায়ের জন্য ব্যস্ত থাকায়, তোমার পত্রের উত্তর যথা সময়ে দিতে পারি নাই। বহু কষ্টে এতদিন পরে সেই টাকাটা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছি। সেই টাকার চেকখানি ইহার সহিত পাঠাইলাম। তুমি ইহা হইতে অনায়াসেই তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে। বাকী টাকায় আমার দিদিমনির জন্য এক ছড়া নেক্‌লেস গড়াইয়া দিও। ইতি—

তোমার—বুড়ো দাদা।

৮

কাজের চরম

১

নিম্নে একখানি প্রকোষ্ঠে বাইসখানি কুশাসন পড়িয়াছে, বাইসখানি থালা তাহাদের সম্মুখে স্থাপিত ;— তাহাতে ভাত ও আলুর দম দেওয়া হইয়াছে। তুইটা করিয়া আলুর দম প্রত্যেকের বরাদ্দ। দেখিতে দেখিতে কুশাসনে মনুষ্য উপবিষ্ট হইল, তৎপরে অন্ন ক্রমেই অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল। বিজয়চন্দ্র এক পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে ছিলেন, তিনি চাহিলেন "ঠাকুর আর গোটা কতক আলুর দম দাও।"

ঠাকুরের স্কন্ধে একখানি মলিন গামছা, গলায় একটী হৃষ্টপুষ্ট পইতা। বিজয়চন্দ্র দম চাহিলে সে বলিল, "আলুর দম আর নাই।"

বিজয়চন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কেন ?"

ঠাকুর উত্তর দিল, "তুটো করিয়াই তো বরাদ্দ।"

বিজয়চন্দ্র সহসা চটিয়া যাইতেন, বলিলেন, "তোর বরাদ্দের না কিছু করেছে ; এই দিকে নিয়ে এস দেখি।"

গোলমাল শুনিয়া অপর পার্শ্ব হইতে একজন বলিলেন, "বিজয় বাবু ব্যাপার কি ?"

বিজয়চন্দ্র করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "দেখুন না মশায় অত্যাচার ! দুটো আলু দিয়াছে তার আবার কড়তা বাদ।" তিনি একটা আলুর অর্দ্ধভাগ উত্তোলন করিয়া ধরিলেন।

বিজয়চন্দ্র নীরব হইলে আবার কয়েক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজয়, কড়তা বাদ কি হে ?"

বিজয়চন্দ্র বিকৃতস্বরে কহিলেন, "দেখ্‌ছ না আলুর আধখানা নেই, ওজনে ভারি হয়ে ছিল বলে, ঠাকুর এর আধখানা কড়তায় কেটে নিয়েছেন।"

গৃহের ভিতর একটা মহা হাসির রোল পড়িয়া গেল। ঠাকুর বেগতিক দেখিয়া বলিল, "আলু আর নেই আপনাকে আর একখানা মাছ বেশি দিচ্ছি।"

বিজয়চন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এইতো বাবা লক্ষ্মী ছেলের মত কথা" তৎপরে মৎস্যের ঝোল দেখিয়া বলিলেন, "বাপু তোমার একি ঝোল ! এ যে বাপ ধাপার বিল। কলে যত জল পেয়েছ সবই কি ঝোল বানিয়ে রেখেছ ?"

আবার একটা হাস্যের তরঙ্গ উঠিল। অনেকেই আহার নাম মাত্র করেন। সেরূপ চমৎকার রন্ধন প্রসূত দ্রব্য আহার করাও অসাধ্য। অনেকেই বৈকালে খাবার-ওয়ালা আসিলে দুই একটা করিয়া চারি পাঁচ আনার জল খাবার খাইয়া ফেলেন; সুতরাং আহারের সময় ক্ষুধার আর তত তীক্ষ্ণতা থাকে না। প্রায় আহার শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, "বিজয় বাবুর সম্বন্ধী বাবু এসেছেন।"

ঝি, মেসের ঝি;—সুতরাং বয়স অল্প তবে নিতান্ত যুবতী বলিতেও পারা যায় না। হাতে চুড়ি আছে, পেড়ে কাপড়ও পরা হইয়া থাকে, কেশেরও বেশ পারিপাট্য আছে, বাবুদের সম্মুখে প্রায়ই মাথার কাপড় সরিয়া যায়, পান দিবার সময় অনেকের মুখের উপরই হাসিয়া ফেলে। সে বাল-বিধবা, উৎপীড়িতা হিন্দু বিধবা বলিয়া বাসার আনন্দ-বাবু তাহাকে বড় দয়ার্দ্র চিত্তে দেখিতেন,—দুই একখানি বস্ত্রও তিনি তাহাকে দিয়া ছিলেন। তাঁহার সময় সময় এমন ইচ্ছাও হইত যে, তিনি অভাগিনীকে বিবাহ করিয়া একটা প্রকৃত সমাজের সদনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন। বিজয়-

চন্দ্র প্রায়ই বলিতেন, ঝি বাজারের পয়সা ভয়ানক চুরি করে, কিন্তু আনন্দবাবু কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। অন্য কাহাকেও জল খাবার আনিতে দিলে, সে তিন পয়সায় ছয়খানি কচুরী আনে কিন্তু ঝিকে দিলে কেবল চারিখানি মাত্র আইসে। ইহাতে আনন্দবাবু ভাবিতেন, অবোধ বালিকা দেখিয়া দোকানদারগণ তাহাকে ঠকায়। ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্ক ঝিকে বালিকা বলা ব্যাকরণ শুদ্ধ কিনা এ বিষয় লইয়া বহুদিন বিজয়চন্দ্রের সহিত তাঁহার মহা বাকবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে, তিনি বলেন, দেহতত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্বের দ্বারা অতি সহজে তিনি ইহা স্বপ্রমাণ করিয়া দিতে পারেন। বিজয়চন্দ্র আহার হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "এ নিশিতে,—কি উদ্দেশ্য ?"

ঝি একটু মৃদু হাসিয়া মস্তকের কাপড় একটু টানিয়া বলিল, "অত জানিনা বাপু, তাঁকে আনন্দবাবুর ঘরে বসিয়ে এসেছি, তিনি আপনাকে খবর দিতে বল্লেন।"

বাবুদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া উঠিলেন, "আরে যাও যাও, খাওয়া রাখ, বড় কুটুম্ব বিশেষ খাতির প্রয়োজন। একেইতো তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কন

না,—তার উপর ভায়ের অখ্যাতির হ'লে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন।”

বিজয়চন্দ্র আহার শেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, “সকলি বরাতে করে, কে রোধিবে তায়।” দেখিতে দেখিতে এক এক করিয়া ক্রমেই সমস্ত কুশাসন শূন্য হইতে লাগিল।

২

বিজয়চন্দ্রের ছোট শ্যালক আনন্দবাবুর গৃহে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আরো দুই চারিজন বাবু এত রাত্রে বিজয়চন্দ্রের সম্বন্ধীর আগমনের কারণ জানিবার জন্য সেই গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, “কি খোকা খবব কি? জামাই বাবুকে নিতে এসেছ নাকি?”

বালক অবনত মস্তকে অতি মৃদুস্বরে বলিল, “কাল জামাই ষষ্টী তাই জামাই বাবুকে বল্‌তে এসেছি। কাল আমাদের বাড়ী যেতে হবে।”

বাবুদের মধ্যে একজন গৃহের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “ওহে বিজয় শুভ সংবাদ!

কাল জামাই ষষ্ঠী তোমার চোব্য চোশ্য লেহ্য পেয়র বন্দোবস্ত।”

“তাই নাকি” বলিয়া ঠিক সেই সময় বিজয়চন্দ্র আনন্দ-বাবুর গৃহে প্রবেশ করিলেন ;—গম্ভীর ভাবে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “তারপর খবর কি, সব ভালোত ?”

বালক সেইরূপ অবনত মস্তকে বলিল, “হাঁ আমাদের বাড়ীর সব ভালো,—আপনি ভাল আছেন তো ?”

বিজয়চন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “অসুখে অশান্তিতে বেশ এক রকম আনন্দেই কেটে যাচ্ছে।”

আনন্দবাবু একপার্শ্বে বসিয়া ছিলেন ;—বলিলেন, “বিজয়বাবু অসুখে অশান্তিতে আনন্দে কেটে যাওয়া কথাটা কিরূপ যুক্তি সঙ্গত হ'লো ?”

বিজয়চন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “যুক্তি সঙ্গত না হ'তে পারে, কিন্তু ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে।”

আনন্দবাবু বিজয়চন্দ্রের দিকে বিস্ফারিত ভাবে চাহিয়া বলিলেন, “যুক্তি সঙ্গত ও ন্যায় সঙ্গত এ দুটো কি ভিন্ন পদার্থ ?”
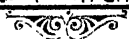
বিজয়চন্দ্র আবার সেইরূপ ভাবেই বলিলেন, "ভিন্ন পদার্থ না হ'তে পারে, কিন্তু ভিন্ন জিনিষ বটে।"

আনন্দবাবু বিরক্ত হইয়া চুপ করিলেন। বালক বলিল, "জামাইবাবু কাল আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতেই হবে।"

বিজয়চন্দ্র বলিলেন, "তাই নাকি ?"

বালক বিজয়চন্দ্রের হস্ত ধরিয়া বলিল, "ও তাই নাকিতে চল্‌বে না, কাল যেতেই হবে ;—না গেলে মা বড় দুঃখীত হবেন।"

বিজয়চন্দ্র একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মাতো দুঃখীত হবেন, কিন্তু তোমার ভগ্নী যে বিশেষ সুখীত হবেন এমনতো বলে বোধ হয় না।"

বালক উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, "ওসব কোন কথা শুনছিনে, বলুন যাবেন ?"

বিজয়চন্দ্র বলিলেন, "কাজে কাজেই !"

"তা হ'লে নিশ্চয় যাবেন, কাল যেন না আমায় আবার আসতে হয়" ;—এই বলিয়া বালক বিদায় হইল। বালকের যাইবার পর আনন্দবাবুর গৃহে এক বিরাট তর্ক

বিতর্ক আরম্ভ হইল। তর্কের বিষয় বিজয়চন্দ্রের কাশ শ্বশুরালয়ে যাওয়া উচিত কি না?" সকলেরই মত যাওয়া উচিত কেবল আনন্দবাবুর ঘোরতর আপত্তি। তিনি বলিলেন, "একেতো ওরূপ দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, তাহার উপর যখন সেই বালিকার বিজয়বাবুকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি আছে; তখন কেবল পিতামাতার কথায় শিক্ষিত হইয়া বিজয়বাবু কখনই তাহার স্বামিত্বের দাবী করিয়া সরলা বালিকার উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে পারেন না।"

গোবিন্দ বলিল, "আনন্দ তুমি কিসে জানিলে বালিকার বিজয়কে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি আছে?"

হরিশ অতি তাচ্ছিল্যস্বরে বলিল, "আরে তুমি কার সঙ্গে তর্ক ক'চ্ছ! ওর ব্রেমি ভণ্ডামি যাবে কোথায়?"

আনন্দবাবু বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন, "হরিশের যে এতদূর অধঃপতন হইয়াছে তাহা জানিতাম না। লেখাপড় শিখিয়া মানুষের যে এতদূর কুসংস্কার থাকিতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না।"

অপর পার্শ্ব হইতে একজন বলিলেন, "ওরকম প্রথম প্রথম অনেকেরই হয়ে থাকে ; দু'দিন বাদে দেখ্‌বেন আনন্দবাবু, ঐ বালিকার ভালবাসায় বিজয়চন্দ্রকে হাবুডুবু খেতে হবে।"

"ভালবাসা!" বলিয়া চক্ষু বিপজ্জয় বিস্ফারিত করিয়া আনন্দবাবু বলিলেন, "তের বছরের শিশু ভালবাসার কি জানে ?"

গোবিন্দ বলিল, "আনন্দ তোমরা ভালবাসাও মান না নাকি, সেও কি একটা কুসংস্কার ?"

হরিশ এতক্ষণ নীরব ছিল, সে আনন্দবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "বাবা তের বছরে শিশু, তা'হলে পাঁচ ছয় বছরে তারা কি প্র—শিশু ? একটু চেপে যাও, তোমার পাগলামি সব সময় আর ভাল লাগে না।"

"এদের সহিত কথা কওয়াই মূর্খতা," বলিয়া ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া আনন্দবাবু গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে ছিলেন, গোবিন্দ বাধা দিয়া বলিল, "আরে ছি! তুমি হরিশের কথায় রাগ কর, ওকি একটা মানুষ।"

ক্রোধে আনন্দবাবুর বাক্যরোধ হইয়া ছিল, তিনি নীরবে নিজের শয্যার উপর উপবেশন করিলেন।

৩

যথা সময়ে বিজয়চন্দ্র শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। একে শ্বশুর-বাড়ী তা'হে জামাই ষষ্ঠী, আহারের ব্যবস্থা গুরুতরই হইল। শ্বশুর-বাড়ীর সুসজ্জিত গৃহের সুপরিষ্কৃত শয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া বিজয়চন্দ্র আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে ছিলেন। আজ এক বৎসরের অধিক হইল তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, নীহার ত্রয়োদশ উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দশে পদার্পণ করিয়াছে অদ্যাবধি তিনি তাহাকে বশে আনিতে পারেন নাই। বিবাহ তাহার নিকট এক্ষণে বিড়ম্বনায় পরিণত হইয়াছে। শ্বশুরের আদর, শ্বশ্রূর স্নেহ, শ্যালকশ্যালিকার যত্ন, কিছুরই অভাব ছিল না; কিন্তু একের জন্য ক্রমেই তাঁহার বিবাহের উপর মর্ম্মান্তিক ঘৃণা হইয়া যাইতে ছিল। স্ত্রী কথা কহিবে না, অঙ্গস্পর্শ করিলে দশহস্ত দূরে সরিয়া যাইবে, ইহা অপেক্ষা জীবনে আর অধিক যন্ত্রণা কি হইতে পারে? তথাপি বিজয়চন্দ্র

হাল ছাড়েন নাই, তিনি জানিতেন, পোষা শান্ত ঘোড়ায় চড়া অপেক্ষা ক্ষিপ্ত দুষ্ট ঘোড়ায় চড়াই অধিক আনন্দ-দায়ক। তিনি এই সকল কথাই ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় নীহারসুন্দরী গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া সেই শয্যার একপার্শ্বে অতি সঙ্কোচিত ভাবে শয়ন করিল। বহুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর বিজয়চন্দ্র একটা প্রবল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভাসুরের পাশে কি শুতে এলে,—না মামাশ্বশুরের বিছানায় শুয়েছ? ঘোমটা খোল—ভয় নেই, প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে না।"

উত্তরের জন্য কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিজয়চন্দ্র নীহারের নিকট একটু সরিয়া যাইয়া ধীরে ধীরে তাহার অবগুণ্ঠন মোচন করিবার জন্য যেমনি হস্ত তুলিয়াছেন, অমনি একখানি টুক্‌টুকে রাঙ্গা হস্তের প্রবল তাড়নায় তাঁহার হস্ত আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে এক হস্ত পরিমাণ অবগুণ্ঠন বৃদ্ধির সহিত সেই টুক্‌টুকে হাত দুইখানির দ্বারা তাহা অতি দৃঢ়ভাবে ধৃত হইল। বিজয়চন্দ্র হতাশভাবে যথাস্থানে শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "বিষম রোগ, এলাপ্যাথিক ওষুধের প্রয়োজন। ঝাঁজওয়ালা ওষুধ

ভিন্ন এ রোগ যাবার নয়।” কিছুক্ষণ গত হইবার পর তিনি আবার একটু একটু সরিয়া একেবারে নীহারের কর্ণের অতি সন্নিকটে মুখ আনিয়া বলিলেন, “কৃপাময়ী ঘোমটা খোল, ভয়ের তো বিশেষ কোন কারণ দেখিনি। আমি মানুষ, অন্য জীব নই। একবার নয়ন মেলে দেখ,— দেখ্‌তেও নেহাত ফেল্‌না নই।”

নীহারের মুখে কথা নাই ;- যেন তাহার বাক্‌শক্তি তাহার কণ্ঠ মধ্যে চির তরে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিজয়চন্দ্র যত নীহারের নিকট সরিয়া যাইতে ছিলেন, সেও তত সরিয়া যাইতে ছিল,—ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াইল, যে আর এক চুল সরিলে তাহার মেঝের সহিত আলিঙ্গনের সম্ভবনা। দুই ঘণ্টাকাল অনুনয় বিনয় তিরস্কার প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তই প্রয়োগ করিয়াও একটীও বাক্য ফুটাইতে না পারায় বিজয়চন্দ্র ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতে ছিলেন, তাহার ধৈর্য্যও সীমার বাহিরে গিয়াছিল। তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বিরক্তিরস্বরে বলিলেন, “বোবার কাছে শোওয়া আমার সাধ্য নয়, ঘোমটা খোলতো খোল নইলে আমি চল্লুম।”

তাঁহার বিশ্বাস ছিল এই কথায় অন্তুতঃ ভয়েও নীহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবে কিন্তু নীহারের বিশেষ কোন চাঞ্চল্য তিনি লক্ষ করিলেন না, সে যে ভাবে শুইয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই শুইয়া রহিল। তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে দ্বারের অর্গল খুলিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৪

বাটীর দরওয়ান ভজন সিং সবেমাত্র তুলসীদাস বন্ধ করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতে যাইতে ছিল, ঠিক সেই সময় বাহির হইতে দ্বারে তিন চারিটা উপর্য্যুপরি ধাক্কা পড়ায় সে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ী গৃহের কোণ হইতে তাহার বহু যত্নের তৈল মর্দ্দিত চারিহস্ত পরিমাণ লম্বা লাঠীটা লইয়া দরজা খুলিয়া দিল। সম্মুখেই জামাইবাবু। সে বিস্ফারিত নয়নে আড়াই হস্ত পরিমাণ বদন বিস্তার করিয়া একটা বিরাট রকম হাই তুলিতে তুলিতে বলিল, "কেয়া হ্যায় মহারাজ জি?"

বিজয়চন্দ্র বিশেষ ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "জোলদি-

জোলদি। তেতলায় আমি যে ঘরে শুয়েছিলেম, সেই ঘরে চোর ঢুকেছে।”

প্রভুভক্ত, অশেষ বুদ্ধিমান ছাতুখোর ভজন সিং বিজয়-চন্দ্রের বাক্য শেষ হইতে না হইতে একেবারে তিন লম্ফে একতল ও দ্বিতলের সিঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া বিজয়চন্দ্র যে গৃহে শয়ন করিয়া ছিলেন সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। বিজয়চন্দ্রও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিয়া ছিলেন, যেমন ভজন সিং গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, তিনিও তৎক্ষণাৎ গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল আঁটিয়া দিলেন। ভজন সিং গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল সমস্ত দেহ বস্ত্রে আচ্ছাদিত খাটের উপর কে শুইয়া রহিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইল সেই চোর। সে মহা হুঙ্কারে তাহার সেই চারিহস্ত পরি-মাণ লাঠী দুই হস্তে তুলিয়া খাটের দিকে অগ্রসর হইল। ভজন সিংএর হুঙ্কারে নীহার ভয়ে তাড়াতাড়ী শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এই অদ্ভুত ব্যাপারে তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল ;—ভয়ে তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। আর একটু হইলে সেই প্রকাণ্ড

লাঠি নীহারের ঘাড়ে পড়িত ; কিন্তু সহসা ভজন সিংএর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়ায়, "আরে রাম! এ কেয়া দিদি বাবু—" বলিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। হতবুদ্ধির ন্যায় একবার চারিদিকে চাহিয়া সে অবনত মস্তকে গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিল, দরজা বাহির হইতে বন্ধ। সে তখন মহা বেয়াকুব হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া অতি কাতর কণ্ঠে, "এ জামাই বাবু, দরজা খুলিয়ে, এ জামাই বাবু দরজা খুলিয়ে", বলিয়া ক্রমাগত দরজায় ভিতর হইতে ধাক্কা দিতে লাগিল।

গোলমালে বাটীর অনেকেরই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। বাড়ীতে চোর ঢুকিয়াছে ভাবিয়া প্রায় সকলেই সেই গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজয়চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ শ্যালক গৃহের দরজায় বাহির হইতে শিকল দেওয়া দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়া তাড়াতাড়ী দরজায় শিকল খুলিয়া দিলেন। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তখন প্রায় সকলেই মহা ব্যস্ত হইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। দরজার সম্মুখেই ভজন সিং ;—বস্ত্রে আপাদমস্তক আবোরিত মহা

সঙ্কুচিত ভাবে খাটের এক পার্শ্বে নীহার দণ্ডায়মান। বিজয়চন্দ্রের বড় শ্যালক গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি, এত গোলমাল কিসের ?"

ভজন সিং ক্রন্দন-সুরে বলিল, "হুজুর জামাইবাবু ঝুট্‌মুট এয়া হাল বানায়া।"

ভজন সিংএর কথার বিশেষ কোন অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তিনি পুনঃরায় ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "কি হয়েছে, তুই এখানে জামাইবাবু কোথায় ?"

বাহির হইতে একজন বলিল, "ওই যে জামাইবাবু ছাদের উপর বেড়াচ্ছেন।" সকলেই চাহিয়া দেখিল,—সম্মুখের ছাদের আলিসার একধারে নীরবে দাঁড়াইয়া বিজয়চন্দ্র সিগারেট টানিতেছেন।

ছোট শ্যালক যাইয়া অবিলম্বে তাঁহার হস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে তথায় আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, "ব্যাপার কি, এতরাত্রে তোমার ঘরে দরওয়ান কেন ?"

বিজয়চন্দ্র প্রবলভাবে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে নীহারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, উনি

কিছুতেই আমার কাছে শুতে রাজি নন, কাজেই দরওয়ানকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। আপনাদের সমস্ত মেয়ে একলা কি করে রেখে যাই বলুন ?”

জ্যেষ্ঠ শ্যালক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “বাবা তোমাকে এটে ওঠা মানুষের সাধ্য নয়। তুমি একেবারে কাজের চরম কল্লে—যাও যাও শোওগে।”

তিনি সকলকে ডাকিয়া লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নীহার তখন পর্য্যন্ত সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া ছিল, বিজয়চন্দ্র শয্যায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, “কিগো বিছানায় শোবে, না দরওয়ান নিয়ে থাকবে।”

নীহার নীরবে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিল, তখনও ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর স্পন্দিত হইতে ছিল, লজ্জায় তাহার সমস্ত দেহ মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে ছিল। বিজয়চন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন, সে কোন আপত্তি করিল না। তখন অতি সোহাগে,—মহা আদরে তিনি তাঁহার পত্নীর অধরে প্রণয়ের শ্রেষ্ঠচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলেন। নীহারের সমস্ত গণ্ড রক্তিমাভ হইয়া গেল।

বোড়ের কিস্তি।

১

বাবুর নাম প্রণয়ভূষণ, বাড়ী যশোহর জেলার অন্তবর্ত্তী ভবানীপুর গ্রামে,—পদবীতে বসু,—বয়স আন্দাজ চব্বিশ। অঙ্কশাস্ত্রে মমতা না থাকায় তাঁহাকে পাশের আশায় জলাঞ্জলী দিয়া অন্য কার্য্য না জুটায় অগত্যা গ্রন্থকার হইতে হইয়া ছিল। কেহ কেহ বলেন,—প্রণয়ভূষণ দ্বিতীয় কালিদাস,—আবার কাহারও কাহারও মতে, প্রণয়ভূষণ বাঙ্গালা ভাষার সপিণ্ডীকরণ করিতেছেন। সে যাহা হউক আমাদের সে কথায় প্রয়োজন কি? তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, প্রণয়ভূষণবাবুর সখের গ্রন্থকার ব্যবসায় লোকসান ভিন্ন লাভ হয় নাই;—সুতরাং বলিতেই হইতেছে প্রণয়ভূষণের পুস্তক বড় অধিক লোকের কর স্পর্শ করে নাই,—করিলেও কেহ পয়সা দিয়া পুস্তক ক্রয় করে নাই। গ্রন্থকার বৃত্তিতে কিছু হয় না দেখিয়া প্রণয়-ভূষণ ক্রমে ভারত উদ্ধারের আশা ত্যাগ করিলেন; বৃদ্ধ

পিতার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কিছু কম বলিয়াই ধারণা ছিল, এক্ষণে অন্যান্যোপায় না দেখিয়া তিনি বাটী আসিলেন ;— অনেক কষ্টে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে পিতাকে খুলিয়া সব কথা বলিলেন। সকল কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা রামব্রহ্ম বসু মহাশয় বলিলেন, "বাপু তোমার যে এত শীঘ্র জ্ঞানলাভ হইল ইহাই আমার কাশীলাভ,—তুমি যে একটা বিধবা মাগী বিবাহ কর নাই, ইহাই আমার প্রয়াগ,—আর তুমি যে চোখ বুজিতে শিখিয়াও তাহা আবার খুলিতে শিখিয়াছ,—ইহাই আমার হরিদ্বার।"

পিতা বহুক্ষণ ধরিয়া আর কোন কথা কন না দেখিয়া প্রণয়ভূষণ বলিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয় ?"

বৃদ্ধ দুই তিন বার কাশিলেন, তৎপরে বলিলেন, "তোমার পিতা ঠাকুর,—তোমার পিতামহঠাকুর,—তোমার প্রপিতা-মহ ঠাকুর,—তোমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহঠাকুর যাহা করিয়াছেন,—তুমিও তাহাই কর।"

সে কি—প্রণয়ভূষণ ভাল বুঝিলেন না,—ভাবিলেন পিতা ব্যাখ্যা করিবেন ; কিন্তু বৃদ্ধ আর কোন কথা না কহিয়া পুঁথি পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা

নীরবে যায় দেখিয়া প্রণয়ভূষণ আবার বলিলেন, "তবে আমাকে এক্ষণে কি করিতে বলেন ?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "দেখ দেশটা এখনও উচ্ছন্ন যায় নাই, —আমাদের চৌদ্দ পুরুষ যাহা করিয়া ধন মান সুখ শান্তি যথেষ্ট পাইয়া আসিয়াছেন তুমিও তাহাই কর। বৌমাকে গৃহে আন ;—গৃহে থাকিয়া জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখ ; নিজের সম্পত্তি আমি থাকিতে থাকিতে বুঝিয়া শুজিয়া লও।"

প্রণয়ভূষণ আবার কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "শ্বশুর মহাশয় কি তাহাকে পাঠাইবেন ? আপনি তো বহুবার আনিতে চাহিয়াছেন কিন্তু কই তাঁহারা তো তাহাকে পাঠান নাই। শ্বশুর মহাশয়ের বিশ্বাস যশোহরের লোক বন মানুষ,—তাঁহার কন্যাকে এখানে পাঠাইলে সেও বন্য হইয়া যাইবে।"

বৃদ্ধ পুঁথি হইতে মস্তক তুলিয়া বলিলেন, "সেই জন্যইতো তোমায় বলিতেছি। শুনতে পাই তুমি অনেক কেতাব টেতাব লেখ ;—আর বুদ্ধি ক'রে নিজের স্ত্রীকে আন্‌তে পারবে না। বিবাদ বিসম্বাদ ব্যতীত যাহাতে গৃহ-

লক্ষ্মী মাকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করিতে পার, সেটুকু বুদ্ধি যদি তোমার না থাকে তবে তুমি আমার সন্তানেরও যোগ্য নও ;—কালই তুমি রওনা হও।”

বৃদ্ধ আবার পুঁতি পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—প্রণয়-ভূষণ দ্বিরুক্তি না করিয়া মাতার নিকট গেলেন। আর উপায় নাই দেশহিতৈষী, পরব্রতী, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ইত্যাদি ইত্যাদি সকলি হইয়াছেন অথচ কোনটীতেই পয়সা নাই ; —গ্রন্থকার পর্য্যন্ত হইলেন তাহাতেও পয়সা নাই, কিন্তু পয়সা না হইলে আর চলে না,—এই সকল নানা বিষয় চিন্তা করিয়া প্রণয়ভূষণ শেষ শ্বশুরালয়ে যাওয়াই স্থির করিলেন।

২

ক্ষেত্রনাথবাবু কলিকাতার বনিয়াদী বড়লোক। বংশ পরম্পরায় তাঁহারা কলিকাতার বড় বড় হউসের মুচ্ছদ্দীর কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। প্রাতে চা পানের পর ক্ষেত্রনাথবাবু খবরের কাগজ পাঠ করিতে-ছিলেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, “জামাই বাবু আসিয়াছেন।”

ক্ষেত্রনাথবাবুর বিনা অনুমতিতে কেহ তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে পারিত না ;—তাই প্রণয়ভূষণ বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ দিলেন। ক্ষেত্রনাথবাবু বিস্মিত ভাবে ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে ? জামাই বাবু,—হুঁ, পাঠাইয়া দাও।"

ভৃত্যের সহিত প্রণয়ভূষণ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন,—ক্ষেত্রনাথবাবু সম্মুখস্থ চেয়ারে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বলিলেন, "তারপর খবর কি ; কি মনে করে ?"

প্রণয়ভূষণ চেয়ারে উপবেশন করিতে করিতে অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাবা একরূপ জোর করেই আমাকে পাঠাইয়া দিলেন—ওকে নিয়ে যাবার জন্য।"

ক্ষেত্রনাথবাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "এ কথা তো তোমার বাবাকে আমি দুশোবার বলেছি যে, আমি মেয়ে পাঠাব না। তোমার সহিত যখন বেণুর বিয়ে হয়, তখন তোমার বাবার সহিত আমার স্পষ্টই কথা ছিল যে, তোমাদের ও বনগায় আমি আমার মেয়ে পাঠাইব না,—তুমি আমার বাড়ী থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবে,—কখন কদাচিৎ দু'মাস ছ'মাসে এক-আদ দিন যাইয়া মা বাপের

সহিত দেখা করিয়া আসিবে ; কিন্তু তুমি এমনই বেয়াড়া যে কলিকাতায় মেসে থাকিলে, তথাপি আমার বাটীতে থাকিলে না। 'যশুরে গোঁ' যাবে কোথায় ?"

এ কথায় প্রণয়ভূষণের মনের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না—কিন্তু তিনি অবিচলিত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে আমারতো বরাবরই সেই ইচ্ছা ;—কিন্তু বাবার নিষেধ,যতদিন পর্য্যন্ত না আপনি আপনার কন্যা পাঠান, ততদিন পর্য্যন্ত যেন আমি না এ বাড়ীতে প্রবেশ করি।"

ক্ষেত্রনাথবাবু গুড়গুড়ীর নলে দুই তিনটা জোরে টান দিয়া বলিলেন, "দেখ ওসব বাবা ফাবা ছাড়। বয়স হয়েছে,—বুদ্ধি হয়েছে,—নিজের পরকালটা ঝরঝরে করে ফেল না। এখানে খাও দাও সুখে থাক,—একটা ভাল চাক্‌রী বাক্‌রী কর। আর যদি আমার কথা না শোন, যা খুসি কর্ত্তে পার আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমার স্পষ্ট কথা আমি মেয়ে কিছুতেই পাঠাইব না। যশুরে লোক শুনেছি মামলায় খুব পরিপক্ক,—ক্ষমতা থাকে তোমার বাবাকে ব'লো, মামলা ক'রে কোর্ট থেকে যেন বৌকে নিয়ে যান।"

প্রণয়ভূষণ দুই তিনবার আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে আজ্ঞে আমিও সেই কথা ভেবে এসেছি,—আমি ওকে সেখানে নিয়ে যেতে একেবারেই রাজী নই,—যে ম্যালেরিয়া।"

"ভালো ভালো, তোমার যে এতদিনে একটু মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে এতেই আমি সন্তুষ্ট,"—এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথবাবু তাহার কনিষ্ঠ পুত্র অতুলকে ডাকিয়া প্রণয়ভূষণকে বাটীর ভিতর লইয়া যাইতে বলিলেন।

৩

মধ্যাহ্নে প্রণয়ভূষণ আহারাদির পর শ্বশুরালয়ে এক অতি পরিপাটী সুসজ্জিত গৃহের সুকোমল শয্যায় অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় শায়িত হইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে ছিলেন। শ্বশুর মহাশয় যে কিছুতেই তাঁহার কন্যাকে পাঠাইবেন না, তাহা তিনি অতি পরিষ্কার ভাবেই স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, অথচ পিতার আদেশ তাহাকে লইয়া যাইতেই হইবে, কিন্তু কি উপায়ে লইয়া যাওয়া যায়? প্রণয়ভূষণ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না,—ঠিক

সেই সময় দরজা বন্ধের শব্দে প্রণয়ভূষণ দ্বারের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন দ্বার বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গেল,—গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া পত্নী রেণুকা। সুবক্তা বলিয়া প্রণয়ভূষণের খ্যাতি ছিল, কিন্তু সেই লাজবিজড়িত চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার সম্মুখে যেন কে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। তাঁহার প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিতে লাগিল। তিন বৎসর তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীর সহিত এইবার লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চমবার সাক্ষাৎ। তিনি ভাবিতে ছিলেন কত স্থানে কত লোকের সম্মুখে বক্তৃতা করিলাম আজ এই দুগ্ধপোষ্য বালিকার নিকট এমন হইল কেন? কিন্তু সে অবস্থায় প্রণয়ভূষণকে অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না, রেণুকা ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া, অতি মৃদু মধুর স্বরে বলিল, "তুমি আমায় কবে নিয়ে যাবে,—সেই ব'লে গিয়ে ছিলে শীঘ্র নিয়ে যাবে, কই তারপর তো এক বৎসর হয়ে গেল?"

প্রণয়ভূষণ তাঁহার স্ত্রীর মুখে এরূপ কথা শুনিবার আশা একবারেই করেন নাই; তাই বিস্ময় বিস্ফারিত

নয়নে কিয়ৎক্ষণ স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি এমন! আমি ভাবিয়াছিলাম তুমিও বুঝি তোমার বাবার মত।"

রেণুকা নীরব,—প্রণয়ভূষণ দেখিলেন বালিকার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। কথাটা যে তাহার প্রাণে এমন আঘাৎ করিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। চির জীবন নিজের খেয়াল লইয়াই কাটাইয়াছেন;—বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অসীম প্রেম, কেতাবে অনেক লিখিয়াছেন, কিন্তু বাস্তব জগতে তাহার আস্বাদন কখনও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই,—তাই বালিকার অশ্রুপূর্ণ নয়নের কাতর দৃষ্টি তাঁহার বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইল। তিনি আদরে তাহাকে হৃদয়ে টানিয়া বলিলেন, "আমার কি সাধ যে, তোমায় এখানে ফেলিয়া রাখি? তোমার বাবা যে তোমাকে আমাদের বোনগায় পাঠাইতে চাহেন না। এ অবস্থায় বল দেখি কেমন করে তোমায় নিয়ে যাই?"

রেণুকা সলজ্জনয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তা আমি কি জানি;—তুমি তার উপায় কর।"

প্রণয়ভূষণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—অতি গম্ভীর-ভাবে বলিলেন,—"হুঁ সেই কথাই ভাব্‌ছি।"

তাহার পর তাহাদের কত কথাই হইল ;—কখন কি ভাবে সময় চলিয়া গিয়াছে কেহই জানিতে পারেন নাই। ঝি বাহির হইতে, "দিদিমণি দরজা খোল,—জামাই বাবুর খাবার এনেছি," সংবাদে তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। লজ্জায় সঙ্কুচিতা রেণুকা তাড়াতাড়ি গৃহের বাহির হইয়া গেল।

৪

সন্ধ্যার পর প্রণয়ভূষণ তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্যালক অতুলকে ডাকিয়া বলিলেন, "চল অতুল, থিয়েটার দেখিয়া আসি।"

অতুল থিয়েটারের নামে পাগল, সে বলিল, "চলুন-চলুন। তাহ'লে আর দেরী ক'রে কাজ নেই।"

প্রণয়ভূষণ বলিলেন, "যাও তুমি শীঘ্র তোমার মাকে বলিয়া এস, আমরা থিয়েটার দেখিতে যাইতেছি।"

অতুল আর কোন কথা না বলিয়া আনন্দে তাড়াতাড়ি সে সংবাদ বাড়ীর ভিতর দিতে গেল, কিন্তু সংবাদ বাড়ীর

ভিতর পৌঁছিবা মাত্র প্রণয়ভূষণের শ্যালিকা ও অন্যান্য বাটীর আর সকলে তাহাকে থিয়েটার দেখাইবার জন্য ধরিয়া পড়িল। অনন্যোপায় হইয়া প্রণয়ভূষণকে সম্মত হইতে বাধ্য হইতে হইল। ক্ষেত্রনাথ বাবুর নিকট এ সংবাদ পৌঁছিবা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ গিন্নিকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ তোমরা প্রণয়ভূষণের সঙ্গে থিয়েটারে যাও আর যেখানে যাও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু খবরদার রেণু যেন না যায়।"

গিন্নি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ওমা সে কি কথা, সবাই যাচ্ছে, আর রেণু যাবে না—তাও কি কখনও হয়।"

ক্ষেত্রনাথ বাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "না না তার যাওয়া হবে না। যশুরে লোক্‌কে আমি বিশ্বাস করি না ওরা সব কর্ত্তে পারে।"

গিন্নি নথ নাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। আমাদের সঙ্গে যাবে, আমাদের কাছ থেকে তো আর তাকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না।"

"তুমি জান না, যশুরে লোক সব পারে। রেণুর যাওয়া কিছুতেই হবে না। তোমাদের ইচ্ছে হয় যেতে

পার, আমি কাল তাকে থিয়েটার দেখিয়ে আন্‌বো,” এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথবাবু গম্ভীরভাবে তাম্রকুট সেবন করিতে লাগিলেন। গিন্নি অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কাজেই রেণুকার যাওয়া হইল না; গিন্নিও প্রথমে যাইতে অস্বীকৃত হইয়া ছিলেন কিন্তু অন্যান্য কন্যাদের বিশেষ পীড়াপিড়ীতে শেষে যাইতে বাধ্য হইলেন; দুইখানি গাড়ী বোঝাই হইয়া রেণুকা ব্যতীত বাড়ীর প্রায় সকলেই থিয়েটার দেখিতে রওনা হইল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে চার ঘটিকার সময় থিয়েটার ভাঙ্গিল। যে গাড়ীতে শ্বশ্রূঠাকুরাণী, অনূঢ়া দুই শ্যালিকা ও মধ্যম শালাজ উঠিয়া ছিল, প্রণয়ভূষণ সেই গাড়ীর ছাদে উঠিলেন, বক্রী অন্যান্য যে গাড়ীতে উঠিয়া ছিল অতুল তাহার ছাদে উঠিল। যথা সময়ে দুই গাড়ী ভবানীপুর ক্ষেত্রনাথবাবুর বাড়ী রওনা হইল। অতুল যে গাড়ীর ছাদে ছিল সেই গাড়ী অগ্রে অগ্রে যাইতে ছিল; কিন্তু জোড়াগির্জ্জার নিকট আসিয়া অতুল পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল পশ্চাতে গাড়ী নাই। সে বরাবর সেয়ালদহ পর্য্যন্ত তাহাদের গাড়ীর পশ্চাতে সে গাড়ী দেখিয়াছে,

সহসা সে গাড়ী কোথায় অন্তর্ধ্যান হইল। বহুক্ষণ সে তথায় সে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিল, কিন্তু তথাপি সে গাড়ীর সাক্ষাৎ নাই। অন্য রাস্তা দিয়া সে গাড়ী নিশ্চয়ই গিয়াছে, শেষে এই ভাবিয়া সে সত্বর বাড়ী যাইবার জন্য গাড়ওয়ানকে গাড়ী হাকাইতে বলিল। বাড়ী আসিয়া গাড়ী পৌছিবা মাত্র সে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সে গাড়ী তখনও আসে নাই। এই আসে এই আসে করিয়া বেলা সাতটা বাজিয়া গেল, তথাপি সে গাড়ীর সন্ধান নাই। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল ততই সকলে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িতে ছিলেন। এরূপভাবে বসিয়া থাকা আর কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া ক্ষেত্রনাথবাবু পুলিসে সংবাদ দিবার জন্য বাহির হইতে-ছিলেন, ঠিক সেই সময় প্রণয়ভূষণের হস্ত লিখিত এক পোষ্টকার্ড ডাকযোগে পাইলেন। তাহাতে মাত্র এই কয়েক লাইন লেখা ছিল :—

মান্যবর শ্বশুর মহাশয়েষু !—

শ্বশ্রু মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া চলিলাম। যতদিন না আপনি আপনার কন্যাকে আমাদের বাটী পাঠান, ততদিন

তাঁহাকে আমাদের ওখানেই অবস্থান করিতে হইবে। আপনার কন্যার পরিবর্ত্তে যখন ইচ্ছা তাঁহাকে লইয়া আসিতে পারেন। তাঁহার সহিত অন্যান্য যাঁহারা যাইতেছেন তাহারা দুই একদিনের মধ্যেই আপনার বাড়ীতে পৌঁছিবেন। ইতিঃ—

প্রণয়।

পত্র পড়িয়া ক্ষেত্রনাথবাবুর ক্রোধে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল,—শীকার পলাইলে সিংহ যেরূপ ক্রোধে গর্জ্জন করিতে থাকে, তাঁহারও আজ সেই অবস্থা। তিনি তৎক্ষণাৎ অতুলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি অদ্যই যশোহর রওনা হও। যদি অনতি বিলম্বে তোমার সহিত তাহাদের না পাঠাইয়া দেয়, বলিয়া আসিবে তাহা হইলে তাহাদের সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, কোর্টে শীঘ্রই অন্যভাবে সাক্ষাৎ হইবে।"

* * * * *

এই ঘটনার পর সাতদিন কাটিয়া গিয়াছে;—অতুল তাহার বৌদিদি ও ভগিনীদ্বয়কে লইয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু তাহার মাতাঠাকুরাণীকে আনিতে পারে নাই। যশুরে

বাব্‌রী চুল ও লম্বা লাঠি দেখিয়া সে বেশ বুঝিয়া আসিয়াছে যে, সেখানে জোর চলিবে না। উপায় বিহীন হইলে মানুষের রাগও অধিক দিন স্থায়ী হয় না,—ক্ষেত্র-নাথবাবুও আজ উপায় বিহীন। তাহার উপর গিন্নীর অভাব তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে ছিলেন, কাজেই বাধ্য হইয়া কন্যাকে পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির করিলেন। শীঘ্রই এক শুভদিনে রেণুকা অতুলের সহিত শ্বশুরালয়ে চলিল ;—যাইবার সময় রেণুকা আসিয়া যখন পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "তবে আসি বাবা",—তখন ক্ষেত্রনাথবাবু কথা কহিতে পারিলেন না, মনে মনে বলিলেন—"বোড়ের কিস্তি—মাৎ।"

পূজার মানত।

যদুনাথের পুত্র নীলমণির দুষ্টামির ধারা কখন কি ভাবে কোন্ দিক্ দিয়া বহিয়া যাইত, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু বেশ আমোদ উপভোগ করিত। কারণ তাহার দুষ্টামির মধ্যেও বেশ একটু আর্ট ছিল।

গুরুমহাশয়ের ভয়ে নীলমণি যেমন সর্ব্বদা সংত্রস্ত হইয়া থাকিত, আবার নীলমণির ভয়ে গুরুমহাশয়ও তেমনি ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার এই ছাত্রটি কখন কি করিয়া বসে!

গুরুমহাশয় প্রতিদিনই মধ্যাহ্নে তাঁহার সেই জীর্ণ টুলখানির উপর বসিয়া বসিয়া নাসিকাগর্জ্জন করিতে থাকিতেন এবং চক্ষু উন্মীলিত না করিয়াই মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেন, "লেখ—লেখ।" এটা বেশ তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সুযোগে নীলমণি ছোট একটি দল বাঁধিয়া সদর্পে পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িত এবং প্রায় দুইঘণ্টা গ্রামবাসীদের

অবিশ্রান্ত উত্যক্ত করিয়া আবার শান্ত ছেলের মত পাঠশালায় আসিয়া বসিত। গুরুমহাশয় তখনও নানা-রূপ মুখ-ভঙ্গীর সহিত দিবানিদ্রার সমস্ত আরামটুকু পূর্ণ উপভোগ করিতে থাকিতেন।

একদিন পাঠশালার ছুটি হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুই তিনটী লোক আসিয়া পণ্ডিত মহামশয়ের কাছে নালিশ করিল যে, দুপুরে তাঁহার ছাত্রেরদল তাহাদের ঘোড়ায় চাপিয়া এমনি ভাবে দৌড় করায় যে, তাহাদের ঘোড়াগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে।

কিন্তু তাহাদের এই নালিশ সত্য জানিলেও নিজের দোষ প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তাহাদের তর্জ্জন করিয়া গুরুমহাশয় বিদায় করিয়া দিলেন, বলিলেন, "তোমাদের মিথ্যা কথা, আমার পড়োরা দুপুর বেলা কোথাও যায় না, আমি ত আর ঘুমিয়ে থাকিনি!"

তাহারা অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল এবং মনে মনে যে গুরুমহাশয়ের খুব শুভ কামনা করিতে করিতে গেল, তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহার কোন লক্ষণই পাওয়া গেল না।

কিন্তু গুরুমহাশয় মনে মনে ঠিক বুঝিলেন এ নীল-মণিরই কাজ। তিনি নীলমণিকে বেশ করিয়া কর্ণমর্দ্দন করিয়া শাসাইয়া দিয়া কহিলেন, "ফের যদি শুনি তুই ঘোড়ায় চড়েচিস্, তা হলে সে দিন আর তোকে আস্ত রাখবো না।"

নীলমণি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, "যে আজ্ঞে,—আর কখ্‌খনও ঘোড়ায় চড়্‌ব না।"

পরদিন বেলা নয়টার পর যখন গুরুমহাশয় আর পাঁচ জন গ্রামের লোকের সহিত গল্প করিতে করিতে নদীতে স্নান করিতে যাইতেছিলেন, সহসা কিসের শব্দে ভীত হইয়া তিনি রাস্তার একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

তার পর বিস্ফারিত নয়নে দেখিলেন তাঁহার সেই অতিবাধ্য ছাত্র নীলিমাণি এক মহিষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মহাকলরবে সেই জন্তুটীকে খেদাইয়া লইয়া আসিতেছে।

গুরুমহাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সে দুই হাত জোড় করিয়া মহাভক্তিভরে মস্তক নত করিয়া কহিল, "আজ্ঞে, আপনি মানা করেচেন, ঘোড়ায় আর কখ্‌খন চড়্‌চিনা।"

তারপর একদিন বিনা কারণে গুরুমহাশয় নীলমণিকে রীতিমত প্রহার করিলেন, নীলমণিও ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য মনের মধ্যে নানারূপ ফন্দী আঁটিতে লাগিল।

গুরুমহাশয় সে দিন একটু অধিক পরিমাণে নাসিকা-গর্জ্জন করিতে করিতে সেই টুলটীর উপর দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ রাখিয়া বেশ আরামে নিদ্রা যাইতেছিলেন,—সহসা নীলমণি সদলবলে 'ওরে বাবারে' বলিয়া এমনি ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল ; যে সর্পদষ্ট ব্যক্তির মত চমকিয়া দুই পা ঊর্দ্ধে তুলিয়া তিনি সশব্দে পার্শ্বস্থিত চুণের গাদার মধ্যে পড়িয়া প্রায় ডুবিয়া যাওয়ার মত হইলেন।

এমনি করিয়া নীলমণি পাঠশালার পড়া সাঙ্গ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিল : সেখানে আসিয়া নীলমণির একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। অবশ্য লোক চক্ষুর সমক্ষে তাহার দুষ্ট বুদ্ধিটা গোপন রহিল বটে—কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহা বেশ পাকিয়া উঠিতে লাগিল।

ক্লাশে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিকট তাহার খুব সুনাম। অন্য ছাত্রেরা যখন নানা প্রকারে শিক্ষকদের বিরক্ত করিত, সে তখন নীরবে মুখ নীচু করিয়া পড়ায় মনোযোগ দিত।

কিন্তু একটা গোপন চাপা হাসি তাহার মুখের উপর সর্ব্বদা ভাসিয়া বেড়াইত। সে যেন অবজ্ঞা ভরে বলিতে চাহে, "ওরে তোরা দুষ্টুমীর কি ধার ধারিস্।"

স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন সাহেব। তখনকার পণ্ডিত মহাশয়রা ইংরাজিটা একেবারেই জানিতেন না;— সুতরাং পারতপক্ষে সাহেবের নিকট যাইতেন না। তাই একদিন ছাত্রদের যখন তিনি কিছুতেই পারিয়া উঠিতে ছিলেন না, তখন নীলমণিকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি নীলমণিকে খুবই বিশ্বাস করিতেন, "দেখ তুমি গিয়ে সাহেবকে বলে এস, যে ছেলেরা ত কিছুতেই আমার কথা শুনচে না, তিনি এর যাহ'ক কিছু বিহিত করে যান;—বুঝলে?"

নীলমণি খুব শান্তভাবে, "যে আজ্ঞা" বলিয়া সাহেবের গৃহের দিকে চলিয়া গেল এবং খানিক পরে পণ্ডিত মহাশয়কে আসিয়া কহিল, "আপনাকে সাহেব এখনি দেখা করতে বল্‌লেন।"

ছেলেরা সভয়ে নীলমণির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। সে গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল,

কাহারও সহিত কোন কথা বলিল না। পণ্ডিতমহাশয় কাপড়টি ঝাড়িয়া চাদরটি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া সাহেবের নিকট চলিয়া গেলেন। সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইতেই সাহেব ভাঙ্গা হিন্দিতে বলিলেন, "আমি কি করব?"

পণ্ডিতমহাশয় থতমত খাইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে আপনি একটু ইচ্ছে না করলে, আমি পেরে উঠ্‌চি না।"

সাহেব আরও বিরক্ত হইলেন, কহিলেন, "একবার বলে দিয়েচি আবার কেন বিরক্ত করতে এসেছ। আমি কিছু করতে পারব না—কিছু করতে পারব না।"

পণ্ডিতমহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, "আজ্ঞে আপনার কাছে না জানালে আর কার কাছে জানাব।"

সাহেব ধমক দিয়া উঠিলেন, "তোমার জন্যে কি আমি অপমান হ'তে যাব? আমাকে কাজ করতে দাও," বলিয়া সাহেব মস্তক অবনত করিয়া কাজ করিতে লাগিলেন।

পণ্ডিতমহাশয় তবুও দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছু একটা বিহিত না করিয়া ক্লাসে ফিরিয়া গেলে ছাত্ররা তাহাকে ত

আর স্কুলেই থাকিতে দিবে না। কি করা যায়? তাই পুনরায় একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, "সার, আপনি যদি একটু মনযোগ না দেন—"

সাহেব এইবার সত্যই ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, "অনুগ্রহ টনুগ্রহ হবে না— না চলে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাও, এই সে দিন মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েচে, আবার মাইনে, যাও পড়াও গিয়ে,—বিরক্ত কর না।"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অপমানিত পণ্ডিতমহাশয় ধীরে ধীরে ক্লাসে ফিরিয়া আসিয়া নীলমণিকে ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "হাঁ হে ছোকরা সাহেবকে আমি কি বল্‌তে পাঠিয়েছিলেম?"

নিরীহ শান্ত ছেলের মত নীলমণি উত্তর করিল, "আজ্ঞে ঠিকই সব কথা বলে এসেচি।"

পণ্ডিতমহাশয় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন "আমি জান্‌তুম তুমি খুব ভাল ছেলে, এখন দেখ্‌চি তুমি ভিজে বেড়াল। কি বলেছিলুম তোমাকে?"

নীলমণি আস্তে আস্তে কহিল, "আজ্ঞে না,—ঠিকইত

বলেচি পণ্ডিতমহাশয়, দশ টাকা বাড়াবার কথাইত সাহেবকে বল্‌তে বল্‌লেন।”

পণ্ডিতমহাশয় বিষম চটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বাড়ী কোথা হে বলত ছোক্‌রা? কালই গিয়ে তোমার অভিভাবককে বলে আস্‌চি।”

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নীলমণি বিনীত স্বরে কহিল, “আজ্ঞে দশ টাকার বেশীর কথা বলেচেন বলে ত আমার মনে পড়চে না। বলেন ত, সাহেবকে আবার না হয় বলে আসি, আমার শুন্‌তে ভুল হয়েছিল। এবার কত টাকার কথা বল্‌তে হবে পণ্ডিতমহাশয়?”

ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, “বাড়ীর ঠিকানা বলবে না, আচ্ছা কেরাণীর কাছে জেনে কাল তোমার বাবাকে ব’লে বুঝিয়ে দেব কি বল্‌তে হ’বে।”

সে দিন হইতে ক্লাসের ছাত্রেরা নীলমণিকে সুধু দলভুক্ত করিয়া ক্ষান্ত রহিল না, তাহাকে মহা সমাদরে দলপতি করিয়া লইল।

ছুটির পর পথে যাইতে যাইতে নীলমণি ভাবিতে

লাগিল, পণ্ডিতমহাশয় সত্যই বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিবে নাকি ? না,—এখন ভাবিয়া কোন ফল নাই। তখন যাহ'ক একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাইবে।

সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময় পশ্চাতে পিতার ব্যগ্র কণ্ঠস্বর শুনিয়া তথায় দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পিতা যদুনাথবাবু সবেমাত্র পল্লীভবন হইতে ফিরিয়াছিলেন তাঁহার হাতে দুইটী আম। আশ্বিন মাস, আমের সময় নয়। যদুনাথবাবু কয়েক বৎসর ধরিয়া বহু যত্ন করিয়া একটী দোফলা আমের গাছ রোপণ করিয়াছিলেন। এইবার সেই গাছে প্রথম আম ফলিয়াছে। পশুপক্ষী এবং লুব্ধ বালকগণের গ্রাস হইতে মাত্র এই দুইটী আম তিনি বহু কষ্টে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক দিনের সাধ তাঁহার স্বহস্ত-রোপিত এই চারা গাছটীর প্রথম ফল তিনি মায়ের পূজায় নিবেদন করিবেন।

তখনই একটা বিশেষ কাজে অন্যত্র যাইতে হইবে, তাই নীলমণির হাতে আম দুইটী দিয়া কহিলেন, "আম দুটো খুব সাবধানে ভাল জায়গায় রেখে দে, মায়ের

পূজোয় দিতে হবে, দেখিস্ যেন কিছুতে মুখ-টুক না দেয়।"

আম দুইটী হাতে লইয়া নীলমণি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, কিন্তু হাত হইতে নামাইতে তাহার প্রাণ চাহিতেছিল না। সদ্য-পাড়া আমের মধুর সুঘ্রাণে তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়া সে পরাজিত হইল;—অবশেষে স্থির করিল যে, পূজায় একটা দিলেই চলিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী আম তাহার লোলুপ রসনার প্রীতি সাধন করিল। যেটী তুলিয়া রাখিবে ভাবিয়া ছিল, সেটী যে, কখন তাহার অজ্ঞাতে উদরে স্থান পাইয়াছিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই।

পরদিন প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিতেই তাহার আমের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার পিতা যে, সেই দুইটী আম পূজার জন্য আনিয়াছিলেন তাহাকে যে অনেক সাবধানে তুলিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন! জানিতে পারিলে তাহার পরিণাম যে কিরূপ ভীষণ হইবে তাহা কল্পনা করিয়া নীলমণি অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। এ যে পূজার মানত!

ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে আসিয়া সে দেখিল সম্মুখেই

পণ্ডিতমহাশয়। বিপদের উপর বিপদ! তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল! উপায়! কিন্তু সে দমিবার পাত্র নহে। হাসিয়া অতি সমাদরে পণ্ডিতমহাশয়কে নমস্কার করিল। সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, "তোমার বাবাকে ডেকে দাও ত হে ছোক্‌রা।"

খানিকক্ষণ নীলমণি চুপ করিয়া রহিল। সহসা তাহার কল্পনা প্রবর মস্তিষ্কে দুষ্ট সরস্বতীর অধিষ্ঠান হইল। অতি বিষণ্ণ স্বরে সে উত্তর করিল, "বাবার আবার সেই রোগটা চাগিয়েছে।"

পণ্ডিতমহাশয় গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগ্‌টা কি?"

অবনত মস্তকে নীলমণি কহিল, "আজ্ঞে এমন কিছু নয়, হঠাৎ মাথাটা কেমন মাঝে মাঝে গরম হ'য়ে ওঠে। তা হ'কগে, আপনি একটু বসুন আমি এখনি ডেকে দিচ্চি"; বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

পণ্ডিত মহাশয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন নিশ্চয়ই আমাকে বিদায় করিবার এ একটা ফন্দী। কিন্তু তবুও তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়া রহিল।

যদুনাথ তখন মুখ হাত ধুইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, নীলমণি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ডাকিল, "বাবা"।

তিনি কহিলেন, "কিরে নীলু ?"

নীলমণি বলিল, "পণ্ডিত মহাশয় আপনার সঙ্গে দেখা করিতে এসেচেন।" বলিয়া থামিয়া ঢোক্ গিলিয়া আবার কহিল, "অসময়ে আমাদের গাছে কেমন আম হয়েচে পণ্ডিতমহাশয়কে দেখাতে গেলুম, দেখে খুব খুসী হয়ে তিনি বল্‌লেন, 'আম দুটো আমি নিয়ে যাই।' আমি কত বল্‌লুম বাবা বক্‌বেন তিনি ত কিছুতেই শুনচেন্ না, নিয়ে চলে যাচ্চেন।"

যদুনাথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, "বলিস্ কি রে, কি সর্ব্বনাশ! আমি যে অনেক দিন থেকে মানত করে রেখেচি, চলে গেল না কি রে ?"

নীলমণি উত্তর করিল, "না এখনও বোধ হয় যাননি।"

আর কোন কথা না বলিয়া যদুনাথ পণ্ডিতমহাশয়ের উদ্দেশে বাহিরে ছুটিলেন।

নীলমণির কথাগুলি লইয়া পণ্ডিতমহাশয় তখনও মনের
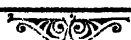
মধ্যে নাড়াচাড়া করিতেছিলেন; এমন সময় যদুনাথ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। যদুনাথের মূর্ত্তি দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের মনে হইল, হয়ত নীলমণির কথাই সত্য! তিনি বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া যদুনাথ করুণস্বরে কহিলেন, "পণ্ডিতমহাশয় একটা দিয়ে যান্।"

পণ্ডিতমহাশয়ের সন্দেহ এইবার সত্যে পরিণত হইল; সত্যই ত মাথা খারাপ! তিনি অবাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যদুনাথ পুনরায় কহিলেন, "পূজার মানত, মশায় একটা দিন্।"

তখন যদুনাথ পণ্ডিতমহাশয়ের একেবারে নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন।

এ যে 'বদ্ধ' পাগল! এখানে আর অপেক্ষা করা সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার গামছার পুঁটুলিটি হাতে করিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন।

পণ্ডিতমহাশয়ের এইরূপ আচরণে যদুনাথ সত্যই রাগিয়া গেলেন;—ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তুমি কি রকম

পণ্ডিত হে, কথা বোঝ না কেন, দুশবার বলচি মায়ের মানত, একটা দাও।”

নীলমণি এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সুযোগ বুঝিয়া সে পণ্ডিতমহাশয়ের নিকটে গিয়া অতি নিরীহের মত বলিল, “একটা দিন না।”

তাহার কথায় পণ্ডিতমহাশয় ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; রাগে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে ছিল। “কিদোষ হে ছোক্‌রা? বাপ বেটায় মতলব, উচ্ছন্ন যাবে!”

ক্রুদ্ধ যদুনাথ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, “আমরা উচ্ছন্ন যাব, না তোমার জিভ খসে যাবে, মায়ের মানত! ভদ্রতা করে একটা চাইচি কিনা।”

পণ্ডিতমহাশয় ভারি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা ফেসাদ, এরা চায় কি?”

নীলমণি তখন পণ্ডিতমহাশয়ের কাণের খুব নিকটে মুখ আনিয়া পিতার অশ্রাব্য স্বরে কহিল “কাণ” তারপর উচ্চকণ্ঠে বলিল, “বাবা বল্‌চেন মায়ের পূজায় একটা না হয় দিলেনই বা।”

পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন ভারি বেগতিক, আর অপেক্ষা

করা সম্পূর্ণ বিপদজ্জনক। তিনি প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই যদুনাথ ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার পুঁটুলিটী চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "যাবে কোথায়, দুটোই রেখে যেতে হবে! ঢের ভদ্রতা করা হয়েছে।"

তখন রাস্তায় রীতিমত লোক জমিয়া গিয়াছে। ব্যাপার জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক! লজ্জায় ও ক্ষোভে পণ্ডিতমহাশয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য দুই হাতে সজোরে পুঁটুলিটি টানিতে লাগিলেন এবং কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা নীলমণি, তোমার বাবাকে সামলাও, পাগলের হাতে প'ড়ে আমি যে যাই—বাবা।"

ব্যাপার যে এতদূর গড়াইবে, নীলমণি তাহার কল্পনা করিতেও পারে নাই। পিতার কথা অমান্য, পূজার মানসিক আম্র ভক্ষণ এবং পণ্ডিতমহাশয়ের লাঞ্ছনা ও কাতর উক্তি—তাহাকে এমন ভাবে বিঁধিতে লাগিল যে, সত্য গোপন করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। তীব্র অনুতাপ তখন তাহার সমস্ত দুষ্ট বুদ্ধিটাকে চিরদিনের মত পুড়াইয়া খাঁক করিয়া দিল। তাহার

ইচ্ছা হইতেছিল এখনি সমস্ত কথা খুলিয়া বলে, কিন্তু সে এমনি অভিভূত হইয়া গিয়াছিল যে, মুখ দিয়া তাহার কোন কথা বাহির হইল না। এতদিন সে অপরকেই হাস্যাস্পদ করিয়া আসিয়াছে, আজ কিন্তু সে তাহার পিতা এবং পণ্ডিত মহাশয়ের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া এমনি ভাবে তাহাদের মুখপানে চাহিয়া রহিল, যে রাস্তার জনসঙ্ঘ তাহার ভাব দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

বেয়াড়া-বিভ্রাট।

দার্শনিক পণ্ডিত উমেশবাবু চিন্তা ও পুস্তক রচনার সুবিধা বিবেচনায় সংসারের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া সহরের প্রান্তভাগে এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র বাটিতে অবস্থান করিতে ছিলেন। নিকটে কাহারও বড় একটা বাস ছিল না। আজ তাঁহার একমাত্র চাকর হোলি খেলিতে ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি প্রায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠ করিয়া সবেমাত্র নিদ্রার আয়োজন করিতে ছিলেন,—ঠিক সেই সময়ে বাহিরের দ্বারের কড়া মহাশব্দে নিনাদিত হইয়া উঠিল। এত রাত্রে কে আবার আসিল দেখিবার জন্য তিনি সত্বর নিচে আসিয়া বাহিরের দরজা খুলিলেন। দ্বারে দণ্ডায়মান একটী ভদ্রলোক ;— অঙ্গে আপাদ মস্তক আবরিত কাল রং এর অলেষ্টার কোট, হস্তে গ্লাডষ্টোন ব্যাগ।

উমেশবাবু দ্বার উন্মুক্ত করিবামাত্র আগন্তুক বলিল, "আপনিই বোধ হয় বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত উমেশবাবু ?"

উমেশবাবু কোনরূপ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে পুনরায় বলিল,—"এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করায় আমি বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত; কিন্তু একটা গুরুতর বিষয়ের পরামর্শের জন্য আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। আর সময় নাই, কাল প্রত্যুষেই আমাকে এখান হইতে রওনা হইতে হইবে। আশা করি এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করায় আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমি আপনার 'ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা সম্বন্ধে' পুস্তক পাঠে বিশেষ প্রীত হইয়াছি। আপনার দার্শনিক যুক্তি সকল পাঠ করিয়া বুঝিলাম, আপনার ন্যায় পণ্ডিত দর্শন শাস্ত্রে সত্যই বিরল। আপনার মাথা সাধারণ উপাদানে গঠিত নহে। কিন্তু কয়েকটা যুক্তির সহিত আমার মতের ঐক্য না হওয়ায় আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইলাম, এক্ষণে যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার মনের সন্দেহ দূর করেন তো চির বাধিত হই।"

উমেশবাবু দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিতে পাইলে আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইতেন; তাঁহার দিন রাত্রি জ্ঞান থাকিত না। তাঁহার মতের সহিত আগন্তুকের মতের মিল

হয় নাই শুনিয়া, তাহার সহিত তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের তর্ক করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল, তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আসুন, আমি আনন্দের সহিত আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার মনের সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা পাইব।"

উমেশবাবু আগন্তুককে তাঁহার বৈঠকখানা গৃহে লইয়া আসিলেন। উমেশবাবু বসিবার পূর্ব্বেই আগন্তুক একখানা চেয়ার টানিয়া তাহাতে উপবেশন করিল। উমেশবাবু তাহার সম্মুখেই অপর একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "আপনার সহিত আমার পূর্ব্বে আর কখনও আলাপ হয় নাই; অপনি কি এই সহরেই থাকেন?"

আগন্তুক তাহার পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে করিতে মস্তক নাড়িয়া বলিল, "না, আমার বাসের কোনরূপ স্থিরতা নাই; আমি যে কখন কোথায় থাকি তাহা আমি নিজেই জানি না; তবে আমি অধিকাংশ সময়েই শূন্যে অবস্থান করিয়া থাকি। আপাততঃ এক্ষণে আমি হিমালয় হইতে আসিতেছি।"

আগন্তুকের কথায় উমেশবাবু বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "হিমালয় হইতে আসিতেছেন? আপনার নামটা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"একশো বার পারেন! আমার নাম আশুতোষ রায়; আমি গোবিন্দপুরের জমিদার। কিন্তু বিষয় সম্পত্তিতে বিশেষ কোনরূপ আশক্তি না থাকায়, সে সমস্তই ত্যাগ করিয়া অন্য নামে দেশে দেশে দর্শন আলোচনায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তবে প্রায়ই অধিকাংশ সময়ই শূন্যে অবস্থান করি।"

উমেশবাবু ভীরু বা দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন না, কিন্তু তথাপি তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন আগন্তুকের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকৃত। পাগল সম্বন্ধে তিনি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন;—সুতরাং এই অপরিচিত আগন্তুক যে সম্পূর্ণ উন্মাদ, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। নিশীথ রাত্রে জনশূন্য গৃহে এরূপ দারুণ উন্মাদের সহিত একাকী অবস্থানে তিনি যে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িবেন

তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই! আগন্তুক উমেশ-বাবুর মনোভাব বুঝিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি আশ্চয্য আপনিও আমাকে তাহাই স্থির করিলেন! আমি ইহার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাই না, কেন মানুষ, আমি কোন কথা কহিবামাত্রই আমাকে উন্মাদ স্থির করিয়া লয়। সেই কারণই আমি আপনার নাম শুনিবামাত্রই আপনার দ্বারা আমার মাথার নিশ্চয়ই উপকার হইবে জানিয়া আপনার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি!"

পাগলকে উত্তেজিত করা কোন মতেই উচিত নহে ভাবিয়া উমেশবাবু যথাসাধ্য মনের অবস্থা মনেই গোপন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনার ভুল হইয়াছে; আমি ডাক্তার নই এবং ডাক্তারী সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। আপনি ডাক্তার অম্বিকাবাবুব নিকট যান, তিনি এই রাস্তার একটু আগেই থাকেন। আসুন আমি আপনাকে তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া উমেশবাবু উঠিতে যাইতেছিলেন কিন্তু ভদ্রলোক ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিল, "বসুন! আপনি আমার কথা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। যদি

ঔষধে—আমার রোগ আরোগ্য হইত তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই আমি রোগ মুক্ত হইতে পারিতাম। এ রোগ ঔষধে সারিবার নহে। আমি বহু সুচিকিৎসককে দেখাইয়াছি, কিন্তু সকলেই শেষে বলিয়াছেন, ঔষধে আপনার রোগ মুক্ত হইবার আশা নাই। আপনার রোগ মুক্তির একমাত্র উপায় আছে, সে কেবল কোন গম্ভীর ও বিচক্ষণ মস্তিষ্কের সহিত আপনার মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন করা,—দ্বিতীয় উপায় নাই। আপনার মস্তিষ্কের ন্যায় বিচক্ষণ মস্তিষ্ক খুব কমই আছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না।"

আগন্তুকের কথায় উমেশবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। এই পাগলের হস্ত হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার মস্তক একেবারে আলোড়িত হইয়া গেল। কিন্তু কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি,—আমার এ সামান্য মস্তিষ্ক আপনার একেবারেই উপযোগী নহে।"

তাঁহার কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া আগন্তুক

বলিল, "আমি এতদিন ধরিয়া যেরূপ মস্তিষ্ক খুঁজিতে ছিলাম এতদিন পরে ঠিক তাহাই পাইয়াছি। আমার মাথার সহিত আপনার মাথা পরিবর্ত্তন করিলে আপনার শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত অবনতি হইবে না।"

উমেশবাবু হতাসভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ অতিশয় স্থূল হওয়ায় শক্তির পরিণাম অতি অল্পই ছিল; তিনি বেশ বুঝিলেন এ উন্মাদের সহিত বল প্রয়োগে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, বরং হিতে বিপরীত হইবে। পাগলকে কোনরূপে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া তাহার সায়ে সায় দিয়া কোন ক্রমে বিদায় করিতে হইবে—অন্য উপায় নাই। তিনি তাঁহার মনের বিচলিত ভাব কিয়ৎপরিমাণ দমন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ ভাল কথা। যদি ইহাতে আপনার উপকার হয়, তবে পরোপকারের জন্য আমার এ কার্য্য সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য।"

উন্মাদ গম্ভীরভাবে বলিল, "এই তো উন্নত মস্তিষ্কবান লোকের কথা। তবে আর অনর্থক কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই।"

সে তাহার গ্লাডষ্টোন ব্যাগ চেয়ারের কাছেই মেজের উপর রাখিয়াছিল, এক্ষণে তাহা টেবিলের উপর তুলিয়া ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করিল, পরে তাহার ভিতর হইতে একখানা প্রকাণ্ড ছোরা বাহির করিয়া টেবিলের উপর সানাইতে সানাইতে বলিল, "এখন আসুন, আমি কেবল আপনার মাথার খুলিটা তুলিয়া তাহার ভিতর হইতে ঘিলুটুকু বাহির করিয়া লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া উন্মাদ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল বলিল, "বাঃ বাঃ বেশ! আপনার মাথায় চুল না থাকায় এ কার্য্যে বিশেষ কোনই কষ্ট পাইতে হইবে না।"

উন্মাদের এই ভয়াবহ কার্য্যে ও কথায় উমেশবাবু প্রায় বাক্যরোধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে হৃদয়ে বল আনিয়া বলিলেন, "বসুন, বসুন! এ সব কার্য্যে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। দাঁড়ান—আপনার সাহায্যের জন্য দুই একজন লোক ডাকিয়া আনি।"

তিনি উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া নিমিষ মধ্যে উঠিয়া তীর বেগে গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন, কিন্তু উন্মাদ তাঁহার পূর্ব্বেই

দ্বারের নিকট আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া বলিল,—“কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই ; আমি একাই একশো। আপনার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই ; ~~আপনি~~ বসুন আমি সব ঠিক করিয়া লইতেছি।”

উমেশবাবু মনে মনে বলিলেন,—“ইচ্ছা করিয়া যমকে ডাকিয়া আনিয়াছি।” তখন তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে মানবের মনের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা যিনি সে অবস্থায় না পড়িয়াছেন তাঁহাব ধারণা করা অসম্ভব। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন ;—প্রাণপণ শক্তিতে আত্মসংযম করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতে ছিলেন। সহসা একটা কথা তাহার মনে উদয় হওয়ায়, তিনি উন্মাদের নিকট হইতে পরিত্রাণের জন্য শেষ চেষ্টায় বলিলেন, “একটু অপেক্ষা করুন, আজ আমার এক আত্মীয় বর্দ্ধমান হইতে আমাকে কিছু সীতাভোগ ও মিহিদানা পাঠাইয়াছেন। আপনি যখন অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটীতে পদধূলি দিয়াছেন তখন প্রথম আপনার কিছু জলযোগ করা উচিত।”

উন্মাদ ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া বলিল, "তাহা হইলে আপনি একটু তৎপর হউন। আমাকে এখনই আবার আপনার মস্তিষ্ক লইয়া হিমালয় রওনা হইতে হইবে।"

উমেশবাবু উন্মাদ যে এত শীঘ্র তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে দিবে তাহা একবারও ভাবেন নাই! এক্ষণে এই ভয়াবহ উন্মাদের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় হইয়াছে ভাবিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি কতকটা আশস্ত হইয়া, "শীঘ্রই আসিতেছি" বলিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যে একবার গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিলেই একেবারে ছুটিয়া সদর রাস্তায় যাইয়া উপস্থিত হইবেন। তৎপরে লোকজন ডাকিয়া উন্মাদটাকে বাটীর বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু তিনি যাহা ভাবিয়া ছিলেন তাহা ঘটিল না, তিনি গৃহের বাহির হইয়া দেখিলেন উন্মাদও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তিনি বেশ বুঝিলেন, এক্ষণে বাটীর বাহির হইবার চেষ্টা করিলেই উন্মাদের হস্তস্থিত সেই প্রকাণ্ড ছোরা তাঁহার হৃদয় ভেদ করিবে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর

থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল ; তাঁহার চিন্তা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পাইতেছিল। বৈঠকখানা গৃহের পার্শ্বেই একটা ক্ষুদ্র গৃহ ছিল, তিনি ছুটিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই গৃহের অর্গল আঁটিয়া দিলেন। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াও তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। গৃহের দ্বারে অর্গল আবদ্ধ করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল এখনি উন্মাদ আসিয়া সবলে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, যদি কোন ক্রমে অর্গল ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আর তাঁহার জীবনের কোন আশা নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উন্মাদ দ্বারে আঘাত করিল না। সে বাহির হইতে চীৎকার করিয়া বার বার বলিতে লাগিল,—"বেরিয়ে আসুন, বেরিয়ে আসুন, আপনার মস্তিষ্ক আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

উন্মাদের প্রত্যেক চীৎকার উমেশবাবুর মর্ম্মে যাইয়া আঘাত করিতে লাগিল। উমেশবাবু কতক্ষণ এই ভয়াবহ চীৎকার শুনিয়াছিলেন তাহা ঠিক বলিতে পারেন না,

তিনি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া গৃহ মধ্যে স্তম্ভিত ভাবে স্পন্দিত হৃদয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। পদ শব্দে বুঝিলেন পাগল আবার তাঁহার বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিল। তিনি দরজা খুলিতে সাহস করিলেন না। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তথায় জীবন্মৃত অবস্থায় অবস্থান করিবার পর যখন দেখিলেন, চারিদিক নীরব হইয়াছে; আর কোথাও কোন শব্দ নাই, তখন তিনি ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন সদর দরজা খোলা, বুঝিলেন উন্মাদ তাঁহাকে না পাইয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি হাপ ছাড়িয়া নিশ্চিন্তের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, মনে মনে বলিলেন, "আজ কি ভয়াবহ বিপদই আমার উপর দিয়া গেল।" তিনি তথাপি পা টিপিয়া টিপিয়া বৈঠকখানার দ্বারে আসিয়া উঁকি মারিলেন। কোথাও কেহ নাই। তিনি বাহিরের দ্বার আবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে উপরে গিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে আর তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। দেখিলেন টেবিলের উপর তাঁহার ক্যাশ বক্স উন্মুক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহার ঘড়ি, ঘড়ির চেন,

আংটী সমস্ত টাকাকড়ি কিছুমাত্র নাই। একটা গ্লাডষ্টোন ব্যাগে যাহা কিছু ধরিতে পারে তাহা সমস্তই গিয়াছে; টেবিলের উপর একখানা ক্ষুদ্র কাগজ পড়িয়া আছে, তাহাতে লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা :—

প্রিয় দার্শনিক উমেশবাবু!

আমার শত সহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কারণ আমি যখন আমার কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম তখন আপনি আমাকে বিরক্ত না করিয়া অন্য গৃহে অর্গল আবদ্ধ করিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম আমার মস্তিষ্কের সহিত মহাশয়ের মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তনের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি স্পষ্টই বুঝিলাম যে, আমার মস্তিষ্ক আপনার মস্তিষ্ক হইতে অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ, সুতরাং আপনার অপদার্থ মস্তিষ্ক আমার নিষ্প্রয়োজন,—বরঞ্চ তাহার অপেক্ষা আপনার টাকা কড়িতে আমার বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া—যতদূর আমার ব্যাগে ধরে—ঠাশিয়া লইয়া প্রস্থান করিলাম,। আপনি যে অতবড় দার্শনিক পণ্ডিত হইয়া আমার নিকটে

এত সহজে পরাভূত হইলেন তাহা ভাবিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বিদায় হইলাম। ইতি :—

উমেশবাবুর মুখে বাক্য নাই ; তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সংসারে এমন জুয়াচোরও আছে, তাঁহাকে গাধা বানাইয়া তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া গেল। এ বিশ্ব বিচিত্র-স্থান। উমেশবাবুর দার্শনিকভাব মাথায় উঠিল।